সাহিত্য সঞ্চয়ন

বাংলা (প্রথম ভাষা)

নবম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথগ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

নবম শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যের বই 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' প্রকাশ করা হলো। বাংলা ভাষাসাহিত্য পাঠ যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেকথা সকলেই স্বীকার করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার মধ্যেই বিষয়ের সার্থকতা। বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টিকে একত্রিত করা হয়েছে 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইটিতে। বইটি তাই বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমেপাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রেরণা জোগাতে বাংলা বিষয়টিকে সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত মানসম্পন্ন বইয়ের প্রয়োজন ছিল। এই বইটিতে তথ্যের ভার যাতে সাহিত্যের প্রকাশ ক্ষমতাকে কোনোভাবেই খর্ব না করে সেই দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। পাঠক্রমের মূল বিষয়গুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হয় তার জন্য বইটিকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জলভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইটির একটিই উদ্দেশ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের কল্পনাশক্তি বিকশিত করা এবং লেখার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করা।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সাহিত্য সঞ্চয়নের পাশাপাশি দ্রুত পঠনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ এবং নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী রচিত একটি ব্যাকরণ গ্রন্থও নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পড়তে হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রেমী মানুষ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই প্রকল্প রূপায়ণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকের পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। ইতোপূর্বে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত পাঠ্যপুস্তক জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ নথিদুটিকে অনুসরণ করে নির্মিত হয়েছে। এবার নবম শ্রেণির নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকগুলি নির্মিত হলো।

নবম শ্রেণির বাংলা প্রথম ভাষার বইয়ের নাম 'সাহিত্য সঞ্চয়ন'। পূর্বতন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত ভাবমূল (Theme) সমূহ থেকে নির্বাচিত কয়েকটিকে এই বইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। ছয়টি পর্বে বিন্যস্ত এই পাঠ্যপুস্তক সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বাংলার অগ্রগণ্য সাহিত্যকারদের রচনায়। অন্যদিকে, অনুবাদের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে ভারতীয় সাহিত্য এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য। 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইয়ের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের সামনে বাংলা সাহিত্যের বহুবর্ণ, বহুবিচিত্র সম্ভারকে পরিবেশন করতে চেয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, নবম শ্রেণির 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' বইটির মাধ্যমে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের গভীর অনুরাগ তৈরি হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পাঠ্যপুস্তক 'সাহিত্য সঞ্চয়ন'-এর সঙ্গে নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী নির্মিত একটি ব্যাকরণ গ্রন্থও শিক্ষার্থীদের পড়া আবশ্যক। পাশাপাশি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ দ্রুতপঠন বা সহায়ক পুস্তক হিসেবে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বইটিকে রঙে-রেখায় অনুপম সৌন্দর্যে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন বরেণ্য শিল্পী শ্রী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডিসেম্বর, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন, ষষ্ঠতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

প্রথম পাঠ

দ্বিতীয় পাঠ

তৃতীয় পাঠ

[*] চিহ্নিত পাঠগুলি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত

কলিঙ্গদেশে ঝড়-বৃষ্টি

মুকুন্দ চক্রবর্তী

মেঘে কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার।
দেখিতে না পায় কেহ অঙ্গ আপনার।।
ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর দুর।।
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগন-মণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল।।
কলিঙ্গে উড়িয়া মেঘ ডাকে উচ্চনাদ।
প্রলয় গণিয়া প্রজা ভাবয়ে বিষাদ।
হুড় হুড় দুড় দুড় বহে ঘন ঝড়।
বিপাকে ভবন ছাড়ি প্রজা দিল রড়।।

ধূলে আচ্ছাদিত হইল যে ছিল হরিত।
উলটিয়া পড়ে শস্য প্রজা চমকিত।।
চারি মেঘে জল দেয় অষ্ট গজরাজ।
সঘনে চিকুর পড়ে বেঙ্গ-তড়কা বাজ।।
করি-কর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার পথ হইল হারা।।
ঘন ঘন শুনি চারি মেঘের গর্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোনো জন।।
পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
কলিঙ্গে সোঙরে সকল লোক যে জৈমিনি।।
হুড় হুড় দুড় দুড় শুনি ঝন ঝন।
না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ।।
গর্ত ছাড়ি ভুজঙ্গ ভাসিয়া বুলে জলে।
নাহি জানি জলস্থল কলিঙ্গ-মণ্ডলে।।
নিরবধি সাত দিন বৃষ্টি নিরন্তর।
আছুক শস্যের কার্য হেজ্যা গেল ঘর।।
মেঝ্যাতে পড়য়ে শিল বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে থাকা তাল।।
চণ্ডীর আদেশ পান বীর হনুমান।
মঠ অট্টালিকা ভাঙ্গি করে খান খান।।
চারিদিকে বহে ঢেউ পর্বত-বিশাল।
উঠে পড়ে ঘরগুলা করে দলমল।।
চণ্ডীর আদেশে ধায় নদনদীগণ।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।।

(নির্বাচিত অংশ)

ধীবর-বৃত্তান্ত

কালিদাস

মহর্ষি কণ্বের তপোবনে তাঁর অনুপস্থিতিতে শকুন্তলাকে বিয়ে করে রাজা দুষ্মন্ত রাজধানীতে ফিরে গেছেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় পরেও শকুন্তলার খোঁজ নিতে কোনো দূত তপোবনে এল না। স্বামীর চিন্তায় যখন শকুন্তলা অন্যমনা তখন তপোবনে এলেন ঋষি দুর্বাসা। শকুন্তলা তা টের না পাওয়ায় ঋষি অপমানিত বোধ করলেন এবং অভিশাপ দিলেন, যাঁর চিন্তায় সে মগ্ন, সেই ব্যক্তি শকুন্তলাকে ভুলে যাবেন। শেষপর্যন্ত সখী প্রিয়ংবদার অনুরোধে ঋষি বললেন যে, কোনো নিদর্শন দেখাতে পারলে তবে শাপের প্রভাব দূর হবে।

দুষ্মন্ত রাজধানীর উদ্দেশে বিদায় গ্রহণের সময় শুকন্তলাকে যে আংটি পরিয়ে দিয়েছিলেন, সখীরা মনে করলেন সেই আংটিই হবে ভবিষ্যতের স্মারকচিহ্ন।

মহর্ষি কণ্ব তীর্থ থেকে ফিরে শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর আয়োজন করলেন। দুষ্মন্ত-সমীপে উপস্থিত হলে তিনি শকুন্তলাকে চিনতেও পারলেন না। এদিকে পথে শচীতীর্থে স্নানের পর অঞ্জলি দেওয়ার সময় হাত থেকে খুলে পড়ে গেছে শকুন্তলার হাতের আংটি। শকুন্তলা অপমানিতা হলেন রাজসভায়।

ঘটনাক্রমে সেই আংটি পেল এক ধীবর...

(তারপর নগর-রক্ষায় নিযুক্ত রাজ-শ্যালক এবং পিছনে হাতবাঁধা অবস্থায় এক পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে দুই রক্ষীর প্রবেশ।)

দুই রক্ষী—(তাড়না করে) ওরে ব্যাটা চোর, বল্—মণিখচিত, রাজার নাম খোদাই করা এই (রাজার) আংটি তুই কোথায় পেলি?

পুরুষ—(ভয় পাওয়ার অভিনয় করে) আপনারা শান্ত হন। আমি এরকম কাজ (অর্থাৎ চুরি) করিনি।

প্রথম রক্ষী—তবে কি তোকে সদ্ ব্রাহ্মণ বিবেচনা করে রাজা এটা দান করেছেন?

পুরুষ—আপনারা অনুগ্রহ করে শুনুন। আমি একজন জেলে, শক্রাবতারে আমি থাকি।

দ্বিতীয় রক্ষী—ব্যাটা বাটপাড়, আমরা কি তোর জাতির কথা জিজ্ঞাসা করেছি?

শ্যালক—সূচক, একে পূর্বাপর সব বলতে দাও। মধ্যে বাধা দিয়ো না।

দুই রক্ষী—তা আপনি যা আদেশ করেন। বল্, কী বলছিলি।

পুরুষ—আমি জাল, বড়শি ইত্যাদি নানা উপায়ে মাছ ধরে সংসার চালাই।

শ্যালক—(হেসে) তা তোর জীবিকা বেশ পবিত্র বলতে হয় দেখছি।

পুরুষ—শুনুন মহাশয়, এরকম বলবেন না।

যে বৃত্তি নিয়ে যে মানুষ জন্মেছে, সেই বৃত্তি নিন্দনীয় (ঘৃণ্য) হলেও তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বভাবে দয়াপরায়ণ হলেও যজ্ঞীয় পশুবধের সময় নির্দয় হয়ে থাকেন।

শ্যালক—তারপর, তারপর?

পুরুষ—একদিন একটা রুই মাছ যখন আমি খণ্ড খণ্ড করে কাটলাম, তখন সেই মাছের পেটের মধ্যে মণিমুক্তায় ঝলমলে এই আংটিটা দেখতে পেলাম। পরে সেই আংটিটা বিক্রি করার জন্য যখন লোককে দেখাচ্ছিলাম তখন আপনারা আমায় ধরলেন। এখন মারতে হয় মারুন, ছেড়ে দিতে হয় ছেড়ে দিন। কীভাবে এই আংটি আমার কাছে এল—তা বললাম।

শ্যালক—জানুক, এর গা থেকে কাঁচা মাংসের গন্ধ আসছে। এ অবশ্যই গোসাপ-খাওয়া জেলে হবে। তবে আংটি পাবার ব্যাপারে যা বলল তা একবার অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। সুতরাং রাজবাড়িতেই যাই।

দুই রক্ষী—তবে তাই হোক। চল রে গাঁটকাটা!

(সবাই এগিয়ে চললেন)

শ্যালক—সূচক, সদর দরজায় সাবধানে এই চোরকে নিয়ে অপেক্ষা কর। ইতিমধ্যে এই আংটি কীভাবে পাওয়া গেল সে-সব বিষয় মহারাজকে নিবেদন করে তাঁর আদেশ নিয়ে ফিরছি।

দুই রক্ষী—আপনি প্রবেশ করুন! মহারাজ এ সংবাদ শুনে খুব খুশি হবেন।

(রাজশ্যালক বেরিয়ে গেলেন)

প্রথম রক্ষী—আমাদের প্রভুর দেখি খুব বিলম্ব হচ্ছে।

দ্বিতীয় রক্ষী—আরে বাবা, অবসর বুঝে তবে না রাজার কাছে যাওয়া যায়।

প্রথম রক্ষী—জানুক, একে মারার আগে (এর গলায় যে) ফুলের মালা পরানো হবে, তা গাঁথতে আমার হাত দুটো (এখনই) নিশপিশ করছে। (জেলেকে দেখিয়ে দিল)

পুরুষ (জেলে)—মহাশয়, বিনা দোষে আমাকে মারবেন না।

দ্বিতীয় রক্ষী—(তাকিয়ে দেখে) এই তো আমাদের প্রভু, মহারাজের হুকুমনামা হাতে নিয়ে এদিকে আসছেন। হয় তোকে শকুনি দিয়ে খাওয়ানো হবে, না হয় কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে।

(রাজশ্যালক প্রবেশ করে)

শ্যালক—সূচক, এই জেলেকে ছেড়ে দাও। আংটি পাওয়ার ব্যাপারে এ যা বলেছে তা সব সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সূচক—তা প্রভু যা আদেশ করেন।

দ্বিতীয় রক্ষী—এই জেলে যমের বাড়ি গিয়ে আবার ফিরে এল। (জেলের হাতের বাঁধন খুলে দিল)

পুরুষ—(শ্যালককে প্রণাম করে) প্রভু, আজ আমার সংসার চলবে কীভাবে?

শ্যালক—মহারাজ আংটির মূল্যের সমান পরিমাণ এই অর্থ খুশি হয়ে তোমায় দিয়েছেন। (জেলেকে টাকা দিলেন)

পুরুষ—(প্রণাম করে গ্রহণ করে) প্রভু, অনুগৃহীত হলাম।

সূচক—এ কি যা-তা অনুগ্রহ! এ যে শূল থেকে নামিয়ে একেবারে হাতির পিঠে চড়িয়ে দেওয়া হলো।

জানুক—হুজুর, যে পরিমাণ পারিতোষিক দেখছি—তাতেই বোঝা যাচ্ছে সেই আংটিটা রাজার (খুব) প্রিয় ছিল।

শ্যালক—দামি রত্ন বসানো বলেই আংটিটা রাজার কাছে মূল্যবান মনে হয়েছে—এমনটা আমার মনে হয় না। সেই আংটি দেখে মহারাজের কোনো প্রিয়জনের কথা মনে পড়েছে। স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির হলেও মুহূর্তের জন্য রাজা বিহ্বলভাবে চেয়ে রইলেন।

সূচক— তাহলে আপনি মহারাজের একটা সেবা করলেন বলতে হয়।

জানুক— তার চেয়ে বল— এই জেলের সেবা করলেন। (জেলেকে হিংসায় ভরা দৃষ্টিতে দেখলেন)

পুরুষ (জেলে)—মহাশয়, এই পারিতোষিকের অর্ধেক আপনাদের ফুলের দাম হিসাবে দিচ্ছি।

জানুক—এটা তুমি ঠিকই বলেছ।

শ্যালক—শোনো ধীবর, এখন থেকে তুমি আমার একজন বিশিষ্ট প্রিয় বন্ধু হলে।

(সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত)

তরজমা : সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী

ইলিয়াস

লিও তলস্তয়

উফা প্রদেশে ইলিয়াস নামে একজন বাস্‌কির বাস করত।

ইলিয়াসের বিয়ের এক বছর পরে যখন তার বাবা মারা গেল তখন সে না ধনী, না দরিদ্র। সাতটা ঘোটকী, দুটো গোরু আর কুড়িটা ভেড়া—এই তার যা কিছু বিষয়-সম্পত্তি। কিন্তু ইলিয়াসের সুব্যবস্থায় তার সম্পত্তি কিছু কিছু করে বাড়তে লাগল। সে আর তার স্ত্রী সকলের আগে ঘুম থেকে ওঠে আর সকলের পরে ঘুমোতে যায়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করে। ফলে প্রতি বছরই তার অবস্থার উন্নতি হতে লাগল।

এইভাবে পঁয়ত্রিশ বছর পরিশ্রম করে সে প্রচুর সম্পত্তি করে ফেলল। তখন তার দুশো ঘোড়া, দেড়শো গোরু-মোষ, আর বারোশো ভেড়া। ভাড়াটে মজুররা তার গোরু-ঘোড়ার দেখাশোনা করে, ভাড়াটে মজুরানিরা দুধ দোয়, কুমিস, মাখন আর পনির তৈরি করে। মোট কথা, ইলিয়াসের তখন খুব বোলবোলাও, পাশেপাশের সকলেই তাকে ঈর্ষা করে। বলে: ‘ইলিয়াস তো ভাগ্যবান পুরুষ; কোনো কিছুরই অভাব নেই; ওর তো মরবারই দরকার নেই।’

ক্রমে ভালো ভালো লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হতে লাগল। দূর দূরান্তর থেকে অতিথিরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। সকলকেই স্বাগত জানিয়ে সে তাদের ভোজ্য পানীয় দিয়ে সেবা করে। যে যখনই আসুক, কুমিস, চা, শরবত আর মাংস সব সময়েই হাজির। অতিথি এলেই একটা বা দুটো ভেড়া মারা হয়; সংখ্যায় বেশি হলে ঘোটকীও মারা হয়।

ইলিয়াসের দুই ছেলে, এক মেয়ে। সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। ইলিয়াস যখন গরিব ছিল, ছেলেরা তার সঙ্গে কাজ করত, গোরু-ভেড়া চরাত। কিন্তু বড়োলোক হওয়ার পরে তারা আয়েশি হয়ে উঠল। বড়োটি এক মারামারিতে পড়ে মারা গেল। ছোটোটি এমন এক ঝগড়াটে বউ বিয়ে করল যে তারা বাপের আদেশই অমান্য করতে শুরু করল। ফলে ইলিয়াসের বাড়ি থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হলো।

ইলিয়াস তাকে একটা বাড়ি দিল, কিছু গোরু-ঘোড়াও দিল। ফলে ইলিয়াসের সম্পত্তিতে টান পড়ল। তারপরেই ইলিয়াসের ভেড়ার পালে মড়ক লেগে অনেকগুলো মরে গেল। তার পরের বছর দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। খড় পাওয়া গেল না একেবারে। ফলে সে-বছর শীতকালে অনেক গোরু-মোষ না খেয়ে মরল। তারপর 'কিরবিজ'রা তার সবচাইতে ভালো ঘোড়াগুলো চুরি করে নিয়ে গেল। ইলিয়াসের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। যত তার অবস্থা পড়তে লাগল ততই তার শরীরের জোরও কমতে লাগল। এমনি করে সত্তর বছর বয়সে ইলিয়াস বাধ্য হয়ে তার পশমের কোট, কম্বল, ঘোড়ার জিন, তাঁবু এবং সবশেষে গৃহপালিত পশুগুলোকে বিক্রি করে দিয়ে দুর্দশার একেবারে চরমে নেমে গেল। আসল অবস্থা বুঝে উঠবার আগেই সে একেবারে সর্বহারা হয়ে পড়ল। ফলে বৃদ্ধ বয়সে স্বামী-স্ত্রীকে অজানা লোকের বাড়িতে বাস করে, তাদের কাজ করে খেতে হতো। সম্বলের মধ্যে রইল শুধু কাঁধে একটা বোঁচকা—তাতে ছিল একটা লোমের তৈরি কোট, টুপি, জুতো আর বুট, আর তার বৃদ্ধা স্ত্রী শাম-শেমাগি। বিতাড়িত পুত্র অনেক দূর দেশে চলে গেছে, মেয়েটিও মারা গেছে। বৃদ্ধ দম্পতিকে সাহায্য করবার তখন কেউ নেই!

মহম্মদ শা নামে এক প্রতিবেশীর করুণা হলো বুড়ো-বুড়ির জন্য। সে নিজে ধনীও নয়, গরিবও নয়, তবে থাকত সুখে, আর লোকও ভালো। ইলিয়াসের অতিথি-বৎসলতার কথা স্মরণ করে তার খুব দুঃখ হলো। বলল :

'ইলিয়াস, তুমি আমার বাড়ি এসে আমার সঙ্গে থাকো। বুড়িকেও নিয়ে এসো। যতটা ক্ষমতায় কুলোয় গ্রীষ্মে আমার তরমুজের ক্ষেতে কাজ করবে আর শীতকালে গোরু-ঘোড়াগুলোকে খাওয়াবে। শাম-শেমাগিও ঘোটকীগুলোকে দুইতে পারবে, কুমিস তৈরি করতে পারবে। আমি তোমাদের দুজনেরই খাওয়া-পরা দেবো। এছাড়া যদি কখনও কিছু লাগে, বলবে, তাও দেবো।

ইলিয়াস প্রতিবেশীকে ধন্যবাদ দিল। সে আর তার স্ত্রী মহম্মদ শার বাড়িতে ভাড়াটে মজুরের মতো কাজ করে খেতে লাগল। প্রথমে বেশ কষ্ট হতো, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সব সয়ে গেল। যতটা পারত কাজ করত আর থাকত।

বুড়ো-বুড়িকে রেখে মহম্মদ শারও লাভ হলো, কারণ নিজেরা একদিন মনিব ছিল বলে সব কাজই তারা ভালোভাবে করতে পারত। তা ছাড়া তারা অলস নয়, সাধ্যমতো কাজকর্ম করত। তবু এই সম্পন্ন মানুষ দুটির দুরবস্থা দেখে মহম্মদ শার দুঃখ হতো।

একদিন মহম্মদ শার একদল আত্মীয় অনেক দূর থেকে এসে তার বাড়িতে অতিথি হলো। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মোল্লা। মহম্মদ শা ইলিয়াসকে একটা ভেড়া এনে মারতে বলল। ইলিয়াস তার চামড়া ছাড়িয়ে, সেদ্ধ করে অতিথিদের কাছে পাঠিয়ে দিল। অতিথিরা খাওয়া-দাওয়া করল, চা খেল, তারপর কুমিস-এ হাত

দিল। মেঝেয় কম্বলের উপরে পাতা কুশনে গৃহস্বামীর সঙ্গে বসে অতিথিরা বাটি থেকে কুমিস পান করতে করতে গল্প করছিল। এমন সময় কাজ শেষ করে ইলিয়াস দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখতে পেয়ে মহম্মদ শা অতিথিদের বলল :

'দরজার পাশ দিয়ে যে বুড়ো মানুষটি চলে গেল তাকে আপনারা লক্ষ করেছেন কি?'

একজন বলল, 'আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু ওর মধ্যে বিশেষ করে দেখবার কিছু আছে নাকি?'

'বিশেষত্ব এই যে, একসময় সে এ তল্লাটের সবচেয়ে ধনী ছিল। নাম ইলিয়াস। নামটা আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন।'

অতিথি বলল, 'নিশ্চয়ই। না শোনবার জো কী? লোকটিকে কখনও চোখে দেখিনি, কিন্তু তার সুনাম ছড়িয়েছিল বহুদূর।'

'অথচ আজ তার কিছু নেই। আমার কাছে মজুরের মতো থাকে, আর তার স্ত্রী আমার ঘোটকীদের দুধ দোয়।'

অতিথি সবিস্ময়ে জিভ দিয়ে চুক্-চুক্ শব্দ করল। ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, 'সত্যি, ভাগ্য যেন চাকার মতো ঘোরে; একজন উপরে ওঠে তো আর একজন তলায় পড়ে যায়। আহা, বলুন তো, বুড়ো লোকটা এখন নিশ্চয়ই খুব বিষণ্ণ?'

'কী জানি, খুব চুপচাপ আর শান্ত হয়ে থাকে। কাজও করে ভালো।'

অতিথি বলল, 'লোকটির সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কি? জীবন সম্পর্কে ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই আমি।'

গৃহস্বামী বলল, 'নিশ্চয়ই পারেন।' তারপর তাঁবুর বাইরে গিয়ে ডাকল : 'বাবাই, একবার এদিকে এসো তো। তোমার বুড়িকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। আমাদের সঙ্গে একটু কুমিস পান করবে।'

ইলিয়াস আর তার স্ত্রী এল। ইলিয়াস অতিথি ও গৃহস্বামীকে নমস্কার করল, প্রার্থনা করল, তারপর দরজার পাশে এক কোণে বসল। তার স্ত্রী পর্দার আড়ালে গিয়ে কর্ত্রীর পাশে বসল।

ইলিয়াসকে এক বাটি কুমিস দেওয়া হলো। সে আবার অতিথি ও গৃহস্বামীকে মাথা নীচু করে নমস্কার করল এবং একটু খেয়ে বাকিটা নামিয়ে রাখল।

অতিথি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা বাবাই, আমাদের দেখে তোমার অতীত জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করে এবং এখনকার দুরবস্থার কথা ভেবে কি খুব কষ্ট হচ্ছে?'

ইলিয়াস হেসে বলল, 'সুখ-দুঃখের কথা যদি বলি, আপনারা হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। বরং আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি মেয়েমানুষ, তাঁর মনেও যা মুখেও তাই। এ বিষয়ে তিনিই পুরো সত্য বলতে পারবেন।'

অতিথি তখন পর্দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা ঠাক্‌মা, আগেকার সুখ আর এখনকার দুঃখ সম্পর্কে তোমার মনের কথাটা বলো তো!'

পর্দার আড়াল থেকে শাম-শেমাগি বলতে লাগল : 'এই হলো আমার মনের কথা : পঞ্চাশ বছর এই বুড়ো আর আমি একত্র বাস করেছি, সুখ খুঁজেছি; কিন্তু কখনও পাইনি। আর আজ এখানে এই আমাদের দ্বিতীয় বছর,

যখন আমাদের কিছুই নেই, যখন আমরা ভাড়াটে মানুষের মতো বেঁচে আছি, তখন আমরা পেয়েছি সত্যিকারের সুখ; আজ আর কিছুই চাই না।'

অতিথিরা বিস্মিত। গৃহস্বামীও বিস্মিত। সে উঠে দাঁড়াল। পর্দা সরিয়ে বুড়ির দিকে তাকাল। দুই হাত ভেঙে বসে সে স্বামীর দিকে চেয়ে হাসছে। স্বামীও হাসছে।

বুড়ি আবার কথা বলল: 'আমি সত্য কথাই বলছি, তামাশা করছি না। অর্ধ-শতাব্দী ধরে আমরা সুখ খুঁজেছি; যতদিন ধনী ছিলাম, কখনও সুখ পাইনি। কিন্তু আজ এমন সুখের সন্ধান আমরা পেয়েছি যে আর কিছুই আমরা চাই না।'

'কিন্তু এখন কীসে তোমাদের সুখ হচ্ছে?'

'বলছি। যখন ধনী ছিলাম, বুড়োর বা আমার এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি ছিল না,—কথা বলবার সময় নেই। অন্তরের কথা ভাববার সময় নেই, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবার সময় নেই। দুশ্চিন্তারও অন্ত ছিল না। হয়তো অতিথিরা এলেন—এক দুশ্চিন্তা : কাকে কী খেতে দিই, কী উপহার দিই যাতে লোকে নিন্দা না করে। আবার অতিথিরা চলে গেলে মজুরদের দিকে নজর দিতে হয়; তারা যেমন কম খেটে বেশি খেতেই ব্যস্ত, তেমনি আমরাও নিজেদের স্বার্থে তাদের উপর কড়া নজর রাখি,—সেও তো পাপ। অন্যদিকে দুশ্চিন্তা—এই বুঝি নেকড়েতে ঘোড়ার বাচ্চা বা গোরুর বাছুরটা নিয়ে গেল। কিংবা চোর এসে ঘোড়াগুলোই নিয়ে সরে পড়ল। রাতে ঘুমোতে গেলাম, কিন্তু ঘুমোবার উপায় নেই, মনে দুশ্চিন্তা —ভেড়ি বুঝি ছানাগুলোকে চেপে মেরে ফেলল। ফলে সারারাত ঘুমই ছিল না। একটা দুশ্চিন্তা পেরোতেই আর একটা এসে মাথা চাড়া দিত,—শীতের জন্য যথেষ্ট খড় মজুত আছে তো! এছাড়া বুড়োর সঙ্গে মতবিরোধ ছিল; সে হয়তো বলল এটা এভাবে করা হোক, আমি বললাম অন্যরকম। ফলে ঝগড়া। সেও তো পাপ। কাজেই এক দুশ্চিন্তা থেকে আর এক দুশ্চিন্তায়, এক পাপ থেকে আর এক পাপেই দিন কাটত, সুখী জীবন কাকে বলে কোনোদিন বুঝিনি।'

'আর এখন?'

'এখন বুড়ো আর আমি একসঙ্গে সকালে উঠি, দুটো সুখ-শান্তির কথা বলি। ঝগড়াও কিছু নেই, দুশ্চিন্তাও কিছু নেই,—আমাদের একমাত্র কাজ প্রভুর সেবা করা। যতটা খাটতে পারি স্বেচ্ছায়ই খাটি, কাজেই প্রভুর কাজে আমাদের লাভ বই লোকসান নেই। বাড়িতে এলেই খাবার ও কুমিস পাই। শীতকালে গরম হবার জন্য লোমের কোট আছে, জ্বালানি আছে। আত্মার কথা আলোচনা করবার বা ভাববার মতো সময় আছে, সময় আছে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবার। পঞ্চাশ বছর ধরে সুখ খুঁজে খুঁজে এতদিনে পেয়েছি।'

অতিথিরা হেসে উঠল। কিন্তু ইলিয়াস বলল, 'বন্ধুগণ হাসবেন না। এটা তামাশা নয়। এটাই মানুষের জীবন, আমার স্ত্রী আর আমি অবুঝ ছিলাম, তাই সম্পত্তি হারিয়ে কেঁদেছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের কাছে সত্যকে উন্মুক্ত করেছেন। আর সে কথা যে আমরা আপনাদের বললাম তা ফুর্তির জন্য নয়, আপনাদের কল্যাণের জন্য।'

তখন মোল্লা বললেন :

'এটা খুবই জ্ঞানের কথা। ইলিয়াস যা বলল সবই সত্য এবং পবিত্র গ্রন্থে লেখা আছে।'

শুনে অতিথিরা ভাবতে বসল।

(সম্পাদিত)

তরজমা : মণীন্দ্র দত্ত

সাত ভাই চম্পা

বিষ্ণু দে

চম্পা! তোমার মায়ার অন্ত নেই,
কত-না পারুল-রাঙানো রাজকুমার
কত সমুদ্র কত নদী হয় পার!
বিরাট বাংলা দেশের কত-না ছেলে
অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই—
চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে।

চম্পা, তোমার প্রেমেই বাংলা দেশ
কত-না শাঙন রজনী পোহাল বলো।
গৌরীশৃঙ্গ মাথা হেঁট টলোমলো,
নিষিদ্ধ দেশে দীপঙ্করের শিখা
চিনে জ্বলে, হয় মঙ্গোলিয়ায় লেখা,
চম্পা, তোমায় চিনেছিল সিংহলও।

তোমাকে খুঁজেছে জানো কি কৃষকে নৃপে
অশ্বের খুরে, লাঙলের ফলা টেনে,
হাতুড়ির ঘায়ে, কাস্তের বাঁকা শানে,
ভাটিয়ালি গানে, কপিলমুনির দ্বীপে;
কলিঙ্গে আর কঙ্কণে গুর্জরে
চম্পা, তোমার সাত ভাই গান করে।

শ্যাম-কাম্বোজে তারা বুঝি টানে দাঁড়,
নীল-কমলের দেশে রেখে আসে হাড়
বহু চাঁদ বহু শ্রীমন্ত সদাগর,
চম্পা, তোমারই পারুল মায়ার লোভে
বাহিরকে ঘর আপনকে করে পর,
বলী হাসে, আসে যবদ্বীপের সাড়।

তোমার বাহুর নির্দেশ দেখে ক্ষোভে
কত প্রাণ গেল, কতজনা নিশি ডেকে
অন্ধ আবেগে বৈতরণীতে ডোবে।
চম্পা, তোমার অবিনশ্বর প্রাণ
এ কোন হিরণমায়ায় রেখেছ ঢেকে,
খুলে দাও মুখ, রৌদ্রে জ্বলুক গান।

কড়ির পাহাড়ে চম্পা, তুমি তো নেই;
কাঞ্চনমালা জানে না তোমার খেই;
তবুও তোমায় খুঁজে মরে সারা দেশ–
ঘোচাও চম্পা, দুস্থ ছদ্মবেশ,
এ মাহ ভাদরে ভরা বাদরের শেষে
চকিতে দেখাও জনগণমনে মুখ–
মুক্তি! মুক্তি! চিনি সে তীব্র সুখ,
সাত ভাই জাগে, নন্দিত দেশ-দেশ।।

দাম

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

স্কুলে কী বিভীষিকাই যে ছিলেন ভদ্রলোক!

আমাদের অঙ্ক কষাতেন। আশ্চর্য পরিষ্কার ছিল মাথা। যেসব জটিল অঙ্ক নিয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পণ্ডশ্রম করেছি, একবার মাত্র তাকিয়ে দেখতেন তার দিকে, তারপরেই এগিয়ে যেতেন ব্ল্যাক বোর্ডে, খস্‌খস্‌ করে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলতো খড়ি। হঠাৎ খড়ি ভেঙে গেলে বিরক্ত হয়ে টুকরো দুটো আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ আর একটা তুলে নিতেন, একটু পরেই আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে দেখতুম—ছবির মতো অঙ্কটা সাজিয়ে দিয়েছেন।

পৃথিবীতে যত অঙ্ক ছিল, সব যেন ওঁর মুখস্থ। কিংবা মুখস্থ বললেও ঠিক হয় না, মনে হতো, আমাদের অদৃশ্য অক্ষরে বোর্ডে আগে থেকেই কষা রয়েছে, অথচ উনি দেখতে পাচ্ছেন ঠিক, আর সঙ্গে সঙ্গে তার উপরে খড়ি বুলিয়ে চলেছেন।

অঙ্কে যারা একশোর মধ্যে একশো পায়, ওঁর ভয়ে তারাই তটস্থ হয়ে থাকত। আর আমাদের মতো যেসব অঙ্ক-বিশারদের টেনেটুনে কুড়িও উঠতে চাইত না, তাদের অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে। প্রকাণ্ড হাতের প্রচণ্ড চড় খেয়ে মাথা ঘুরে যেত, কিন্তু কাঁদবার জো ছিল না। চোখে এক ফোঁটা জল দেখলেই ক্লাস ফাটিয়ে হুঙ্কার ছাড়তেন: পুরুষ মানুষ হয়ে অঙ্ক পারিসনে—তার উপরে কাঁদতে লজ্জা করে না? এখনি পা ধরে স্কুলের পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

তা উনি পারতেন। ওঁর চড়ের জোর থেকেই আমরা তা আন্দাজ করে নিয়েছিলুম।

পুরুষমানুষ হয়ে অঙ্ক পারে না—এমন অঘটন কল্পনাও করতে পারতেন না মাস্টার মশাই। বলতেন, প্লেটোর দোরগোড়ায় কী লেখা ছিল, জানিস? যে অঙ্ক জানে না—এখানে তার প্রবেশ নিষেধ। স্বর্গের দরজাতেও ঠিক ওই কথাই লেখা রয়েছে—যদি সেখানে যেতে চাস, তা হলে—

স্বর্গের খবরটা মাস্টারমশাই কোত্থেকে যোগাড় করলেন তিনিই জানেন। প্লেটো কে, তাঁর দরজা দিয়ে ঢুকতে না পারলে কী ক্ষতি হবে, এ নিয়ে আমরা কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। তাছাড়া যে স্বর্গে পা দিয়েই জ্যামিতির এক্সট্রা কষতে হবে কিংবা স্কোয়ার মেজারের অঙ্ক নিয়ে বসতে হবে, সে স্বর্গের চাইতে লক্ষ যোজন দূরে থাকাই আমরা নিরাপদ বোধ করতুম।

ম্যাট্রিকুলেশনের গণ্ডী পার হয়ে অঙ্কের হাত থেকে রেহাই পেলুম, মাস্টারমশাইয়ের হাত থেকেও। কিন্তু অঙ্কের সেই বিভীষিকা মন থেকে গেল না। এম-এ পাশ করবার পরেও স্বপ্ন দেখেছি, পরীক্ষার লাস্ট বেল পড়ো-পড়ো, অথচ একটা অঙ্কও আমার মিলছে না। মাস্টারমশাই গার্ড হয়ে একবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, দু-চোখ দিয়ে তাঁর আগুন ঝরছে। দাঁতে দাঁতে ঘষে বলছেন—

মাথার উপর ঘুরন্ত পাখা সত্ত্বেও ঘামে নেয়ে আমি জেগে উঠেছি। মৃদু নীল আলোয় দেখেছি চেনা ঘরটাকে, চোখে পড়েছে সামনে আমার পড়ার টেবিল, আমার বইপত্রের স্তূপ। গভীর তৃপ্তির সঙ্গে ভেবেছি, এখন আর আমাকে স্কুলে অঙ্ক কষতে হয় না, আমি কলেজে বাংলা পড়াই।

একদিন একটি পত্রিকার পক্ষ থেকে ফরমাশ এল, আমার ছেলেবেলার গল্প শোনাতে হবে। আমি জানালুম, লেখক হিসেবে আমি নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি, আমার ছেলেবেলার গল্পে কারো কোনো কৌতূহল নেই। তাছাড়া এমন কোনো স্মরণীয় ঘটনা ঘটেনি যে আসর করে তা লোককে শোনাতে পারি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ছাড়লেন না, তাঁরা জানালেন, সাহিত্যের ইন্দ্র চন্দ্র মিত্র বরুণেরা কেউ তাঁদের বিশেষ পাত্তা দেননি, অতএব—

অতএব আমি ভাবলুম, তা হলে নির্ভয়ে লিখতে পারি। ওঁরা নিজেরা ছাড়া ওঁদের কাগজের বিশেষ পাঠক নেই, সুতরাং আমার আত্মকথা কারো কাছে স্পর্ধার মতো মনে হবে না। কয়েকটি ঘরোয়া মানুষের কাছে ঘরোয়া গল্প বলব—ওটা প্রীতির ব্যাপার, পদমর্যাদার নয়। কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলুম।

মনে এল মাস্টারমশাইয়ের কথা। লিখলুম তাঁকে নিয়েই।

ছবিটা যা ফুটল, তা খুব উজ্জ্বল নয়। লেখবার সময় কল্পনার খাদ কিছু মিশিয়ে নিলুম সেটা বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে সদুপদেশও একটু বর্ষণ করেছিলুম। মূল কথাটা এই ছিল, অহেতুক তাড়না করে কাউকে শিক্ষা দেওয়া যায় না, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে গেলে গাধাটাই পঞ্চত্ব পায়। তার প্রমাণ আমি নিজেই। মাস্টার মশাই আমাকে এত প্রহার করেও অঙ্ক শেখাতে পারেননি, বরং যা শিখেছিলুম তা-ও ভুলেছি। এখন দুই আর দুইয়ে চার না পাঁচ হয়, তাই নিজের মধ্যে সন্দেহ জাগে।

পত্রিকার কর্তৃপক্ষ খুশি হয়ে আমাকে দশ টাকা দক্ষিণা দিয়ে গেছেন। মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে এইটুকুই আমার নগদ লাভ।

তারপরে আরো অনেকদিন পার হয়ে গেল। সেই লেখার কথা ভুলে গেলুম, ভুলে গেলুম মাস্টারমশাইকেও। বয়স বেড়েছে, বিনিদ্র রাত্রিযাপনের মতো অনেক সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে জীবনে। বর্তমানের দাবিটা এত বেশি জোরালো যে স্মৃতির দিকে তাকাবার অবসর পর্যন্ত মেলে না।

এমনি সময় বাংলাদেশের এক প্রান্তের একটি কলেজ থেকে ডাক এল। ওঁদের বার্ষিক উৎসব, অতএব আতিথ্য নিতে যেতে হবে ওখানে। এবং বক্তৃতা দিতে হবে।

এই সব উপলক্ষেই বিনাপয়সায় বেড়ানো যায়। তাছাড়া কলকাতা থেকে কেউ বাইরে গেলেই তার রাজোচিত সম্বর্ধনা মেলে—এখানকার চড়ুই পাখিও সেখানে রাজহংসের সম্মান পায়। কলকাতা থেকে দূরত্বটা যত বেশি হয়, আমাদের মতো নগণ্যের পক্ষে ততই সুখাবহ।

আমি সুযোগটা ছাড়তে পারলুম না।

গিয়ে পৌঁছুতে চা-খাবার-আতিথেয়তার উচ্ছ্বাস। ছেলেরা তো এলই, দু'চারজন সম্ভ্রান্ত লোক এসেও বিনীতভাবে আলাপ করে গেলেন। এমন কি খানকয়েক অটোগ্রাফের খাতা পর্যন্ত এগিয়ে এল। রোমাঞ্চিত কলেবরে আমি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে বাণী বিতরণ করতে লাগলুম, ব্যক্তি হিসেবে আমি যে এত মূল্যবান এর আগে কে ভেবেছিল সে-কথা।

সভায় জাঁকিয়ে বক্তৃতা করা গেল। রবীন্দ্রনাথ থেকে বারোটা উদ্ধৃতি দিলুম, কার একটা ইংরেজি কোটেশন চালিয়ে দিলুম বার্নার্ড শ'র নামে, শেষে দেশের তরুণদের নিদারুণভাবে জাগ্রত হতে বলে যখন টেবিলে একটা প্রকাণ্ড কিল মেরে বক্তৃতা শেষ করলুম, তখন অল্পের জন্যে ফুলদানিটা রক্ষা পেলো। আর হল-ফাটানো হাততালিতে কান বন্ধ হওয়ার জো।

বুড়ো প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে আমাকে বললেন, ভারী চমৎকার বলেছেন আপনি, যেমন সারগর্ভ, তেমনি সুমধুর।

আমি বিনীত হাসিতে বললুম, আজ শরীরটা তেমন ভালো নেই, তাই মনের মতো করে বলতে পারলুম না।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেরা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল।

শরীর ভালো নেই, তাতেই এরকম বললেন স্যার। শরীর ভালো থাকলে তো—

অর্থাৎ প্রলয় হয়ে যেত। আমি উদার হাসি হাসলুম। যদিও মনে মনে জানি, এই একটি সর্বার্থসাধক বক্তৃতাই আমার সম্বল, রবীন্দ্র জন্মোৎসব থেকে বনমহোৎসব পর্যন্ত এটাকেই এদিক ওদিক করে চালিয়ে দিই।

স্তুতিতে স্ফীত মনে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছি, এমন সময় একটি ছেলে এসে খবর দিলে—এক বুড়ো ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, বেশ তো, ডেকে আনো এখানে।

ছেলেটি বললে, তিনি আসতে চাইছেন না—বাইরে মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমার বক্তৃতায় নিশ্চয় কেউ অভিভূত হয়েছেন, আমাকে অভিনন্দন জানাবেন। এ অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে। সুতরাং দাক্ষিণ্য-পুলকিত চিত্তে আমি বললুম, আচ্ছা চলো, আমি যাচ্ছি।

হলের বাইরে ছোটো একটা মাঠ তরল অন্ধকারে ঢাকা। অত আলো থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমে ভালো করে কিছু দেখতে পেলুম না। তারপর চোখে পড়ল মানুষটিকে। কুঁজো লম্বা চেহারা, মাথার সাদা চুলগুলি চিকমিক করছে।

ডাকলেন, সুকুমার!

আমি চমকে উঠলুম। এখানে কেউ আমার নাম ধরে ডাকতে পারে সেটা যেমন আশ্চর্য, তারও চেয়ে আশ্চর্য ওই গলার স্বর। আমার মনটাকে অদ্ভুতভাবে দুলিয়ে দিল। স্মৃতির অন্ধকার থেকে একটা ভয়ের মৃদু শিহরণ আমার বুকের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল।

—আমাকে চিনতে পারছ না সুকুমার? আমি—

চিনেছি। ভয় পাওয়ার অর্থটা বুঝতেও আর বাকি নেই। ওই ডাক শুনে ছেলেবেলায় বহুদিন আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে এসেছে—জানি এখনই একটা ভয়ংকর চড় আমার পিঠের উপর নেমে আসবে। সেই ভয়টার কঙ্কাল লুকিয়ে ছিল মনের চোরাকুঠুরিতে—ওই স্বর বিদ্যুতের আলোর মতো তাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

আমার মাথা তখনই ওঁর পায়ে নেমে এল।

—মাস্টারমশাই, আপনি!

মাস্টারমশাই বললেন, বেঁচে থাকো বাবা, যশস্বী হও। রিটায়ার করার পর এখানে এসেই মাথা গুঁজেছি। বাড়ি থেকে বেরুই না, আজ তুমি বক্তৃতা করবে শুনে ছুটে এসেছি। খুব ভালো বলেছ সুকুমার, খুব খুশি হয়েছি।

কিন্তু আমি খুশি হতে পারলুম না। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন মাস্টারমশাই, বুদ্ধিতে ছুরির ফলার মতো ঝক্‌ঝক্ করত চোখ। আজ আমার বক্তৃতার ফাঁপা ফানুস দিয়ে যদি ওঁকে ভোলাতে পেরে থাকি, তাহলে সেটা আমার কৃতিত্বে নয়, ওঁর মনেরও বয়স বেড়েছে বলে।

অপরাধীদের মতো চাইলুম, না স্যার, আপনার সামনে—

মাস্টারমশাই আমাকে বলতে দিলেন না।

তোমরাই তো আমাদের গর্ব, আমাদের পরিচয়। কিছুই দিতে পারিনি, খালি শাসন করেছি, পীড়ন করেছি।—বলতে বলতে জামার পকেট থেকে বের করলেন শতচ্ছিন্ন এক জীর্ণ পত্রিকা: একদিন আমার ছেলে এইটে এনে আমাকে দেখালে। পড়ে আনন্দে আমার চোখে জল এল। কতকাল হয়ে গেল, তবু সুকুমার আমাকে মনে রেখেছে, আমাকে নিয়ে গল্প লিখেছে। সকলকে এই লেখা আমি দেখাই, বলি দেখো, আমার ছাত্র আমাকে অমর করে দিয়েছে।

মুহূর্তে আমার জিভ শুকিয়ে গেল, লজ্জায় আত্মগ্লানিতে আমার মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। একটা কিছু বলতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু মুখে কথা ফুটল না।

মাস্টারমশাইয়ের গলা ধরে এসেছিল। একটু চুপ করে থেকে বললেন, কী যে আমার আনন্দ হয়েছে সুকুমার, কী বলব! তোমার এই লেখাটা সব সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। দু-একজন বলে, যেমন ধরে ধরে মারতেন, তেমনি বেশ শুনিয়ে দিয়েছে আপনাকে। আমি বলি, শোনাবে কেন—কত শ্রদ্ধা নিয়ে লিখেছে। আর সত্যিই তো—অন্যায় যদি করেই থাকি, ওরা ছাত্র—ওরা সন্তান—বড়ো হলে সে অন্যায় আমার শুধরে দেবে বই কি। জানো সুকুমার, আনন্দে তোমাকে আমি একটা চিঠিও লিখেছিলুম। কিন্তু পাঠাতে সাহস হয়নি। তোমরা এখন বড়ো হয়ে গেছ—এখন—

আর বলতে পারলেন না। আবছা আলোটায় এখন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলুম, দেখলুম, মাস্টারমশাইয়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

মনে হলো, স্নেহ-মমতা-ক্ষমার এক মহাসমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। সেই স্নেহ—কোটি মণি-মাণিক্য দিয়ে যার পরিমাপ হয় না; সেই মমতা—যার দাম সংসারের সব ঐশ্বর্যের চাইতে বেশি; সেই ক্ষমা—কুবেরের ভাণ্ডারকে ধরে দিয়েও যা পাওয়া যায় না।

আমি তাঁকে দশ টাকায় বিক্রি করেছিলুম। এ অপরাধ আমি বইব কী করে, এ লজ্জা আমি কোথায় রাখব!

এই জীবন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বাঁচতে হবে বাঁচার মতন, বাঁচতে বাঁচতে
এই জীবনটা গোটা একটা জীবন হয়ে
জীবন্ত হোক
আমি কিছুই ছাড়ব না, এই রোদ ও বৃষ্টি
আমাকে দাও ক্ষুধার অন্ন
শুধু যা নয় নিছক অন্ন
আমার চাই সব লাবণ্য
নইলে গোটা দুনিয়া খাব!
আমাকে কেউ গ্রামে-গঞ্জে ভিখারি করে
পালিয়ে যাবে?
আমায় কেউ নিলাম করবে সুতো কলে,
কামারশালায়?
আমি কিছুই ছাড়ব না আর, এখন আমার
অন্য খেলা
পদ্মপাতায় ফড়িং যেমন আপনমনে খেলায় মাতে
গোটা জীবন
মানুষ সেজে আসা হলো,
মানুষ হয়েই ফিরে যাব
বাঁচতে হবে বাঁচার মতন, বাঁচতে বাঁচতে
এই জীবনটা গোটা একটা জীবন হয়ে
জীবন্ত হোক!

নব নব সৃষ্টি

সৈয়দ মুজতবা আলী

সংস্কৃত ভাষা আত্মনির্ভরশীল। কোনো নূতন চিন্তা, অনুভূতি কিংবা বস্তুর জন্য নবীন শব্দের প্রয়োজন হলে সংস্কৃত ধার করার কথা না ভেবে আপন ভাণ্ডারে অনুসন্ধান করে, এমন কোনো ধাতু বা শব্দ সেখানে আছে কি না যার সামান্য অদল বদল করে কিংবা পুরোনো ধাতু দিয়ে নবীন শব্দটি নির্মাণ করা যায় কি না। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, সংস্কৃত কস্মিনকালেও বিদেশি কোনো শব্দ গ্রহণ করেনি। নিয়েছে, কিন্তু তার পরিমাণ এতই মুষ্টিমেয় যে, সংস্কৃতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা বলাতে কারও কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

প্রাচীন যুগের সব ভাষাই তাই। হিব্রু, গ্রিক, আবেস্তা এবং ঈষৎ পরবর্তী যুগের আরবিও আত্মনির্ভরশীল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা আত্মনির্ভরশীল নয়। আমরা প্রয়োজন মতো এবং অপ্রয়োজনেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ নিয়েছি এবং নিচ্ছি। পাঠান-মোগল যুগে আইন-আদালত খাজনা-খারিজ নূতন রূপে দেখা দিল বলে আমরা আরবি ও ফার্সি থেকে প্রচুর শব্দ গ্রহণ করেছি। পরবর্তী যুগে ইংরেজি থেকে ইংরেজির মারফতে অন্যান্য ভাষা থেকে নিয়েছি এবং নিচ্ছি।

বিদেশি শব্দ নেওয়া ভালো না মন্দ সে প্রশ্ন অবান্তর। নিয়েছি এবং এখনও সজ্ঞানে আপন খুশিতে নিচ্ছি এবং শিক্ষার মাধ্যমরূপে ইংরেজিকে বর্জন করে বাংলা নেওয়ার পর যে আরও প্রচুর ইউরোপীয় শব্দ আমাদের ভাষায় ঢুকবে, সে সম্বন্ধেও কারও কোনো সন্দেহ নেই। আলু-কপি আজ রান্নাঘর থেকে তাড়ানো মুশকিল, বিলিতি ওষুধ প্রায় সকলেই খান, ভবিষ্যতে আরও নূতন নূতন ওষুধ খাবেন বলেই মনে হয়। এই দুই বিদেশি বস্তুর ন্যায় আমাদের ভাষাতেও বিদেশি শব্দ থেকে যাবে, নূতন আমদানিও বন্ধ করা যাবে না।

পৃথিবীতে কোনো জিনিসই সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। অন্তত চেষ্টা করাটা অসম্ভব নাও হতে পারে। হিন্দি উপস্থিত সেই চেষ্টাটা করছেন—বহু সাহিত্যিক উঠে পড়ে লেগেছেন, হিন্দি থেকে আরবি, ফার্সি এবং ইংরেজি শব্দ তাড়িয়ে দেবার জন্য। চেষ্টাটার ফল আমি হয়তো দেখে যেতে পারব না। আমার তরুণ পাঠকেরা নিশ্চয়ই দেখে যাবেন। ফল যদি ভালো হয় তখন তাঁরা না হয় চেষ্টা করে দেখবেন। (বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে লিখেছেন, ‘আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।’ নজরুল ইসলাম ‘ইনকিলাব’—‘ইনক্লাব’ নয়—এবং ‘শহিদ’ শব্দ বাংলায় ঢুকিয়ে গিয়েছেন। বিদ্যাসাগর ‘সাধু’ রচনায় বিদেশি শব্দ ব্যবহার করতেন না, বেনামিতে লেখা ‘অসাধু’ রচনায় চুটিয়ে আরবি-ফার্সি ব্যবহার করতেন। আর অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হরপ্রসাদ আরবি-ফার্সি শব্দের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা ‘আহাম্মুখী’ বলে মনে করতেন। ‘আলাল’ ও ‘হুতোম’-এর ভাষা বিশেষ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল; সাধারণ বাংলা এ-স্রোতে গা ঢেলে দেবে না বলে তার উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন এবং হিন্দির বঙ্কিম স্বয়ং প্রেমচন্দ্র হিন্দিতে বিস্তর আরবি-ফার্সি ব্যবহার করেছেন।)

এস্থলে আর একটি কথা বলে রাখা ভালো। রচনার ভাষা তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে। শংকরদর্শনের আলোচনায় ভাষা সংস্কৃতশব্দবহুল হবেই, পক্ষান্তরে মোগলাই রেস্তোরাঁর বর্ণনাতে ভাষা অনেকখানি ‘হুতোম’-ঘ্যাঁষা হয়ে যেতে বাধ্য। ‘বসুমতী’র সম্পাদকীয় রচনার ভাষা এক—তাতে আছে গাম্ভীর্য, ‘বাঁকা চোখে’র ভাষা ভিন্ন—তাতে থাকে চটুলতা।

বাংলায় যে-সব বিদেশি শব্দ ঢুকেছে তার ভিতরে আরবি, ফার্সি এবং ইংরেজিই প্রধান। সংস্কৃত শব্দ বিদেশি নয়, এবং পোর্তুগিজ, ফরাসি, স্প্যানিশ শব্দ এতই কম যে, সেগুলো নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই।

বাংলা ভিন্ন অন্য যে-কোনো ভাষার চর্চা আমরা করি না কেন, সে ভাষার শব্দ বাংলাতে ঢুকবেই। সংস্কৃত চর্চা এদেশে ছিল বলে বিস্তর সংস্কৃত শব্দ বাংলায় ঢুকেছে, এখনও আছে বলে অল্পবিস্তর ঢুকছে, যতদিন থাকবে ততদিন আরও ঢুকবে বলে আশা করতে পারি। স্কুল-কলেজ থেকে যে আমরা সংস্কৃত চর্চা উঠিয়ে দিতে চাই না তার অন্যতম প্রধান কারণ বাংলাতে এখনও আমাদের বহু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন, সংস্কৃত চর্চা উঠিয়ে দিলে আমরা অন্যতম প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হব।

ইংরেজির বেলাতেও তাই। বিশেষ করে দর্শন, নন্দনশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি জ্ঞান এবং ততোধিক প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের শব্দ আমরা চাই। রেলের ইঞ্জিন কী করে চালাতে হয়, সে সম্বন্ধে বাংলাতে কোনো বই আছে বলে জানি নে, তাই এসব টেকনিক্যাল শব্দের প্রয়োজন যে আরও কত বেশি সে সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা এখনও আমাদের মনের মধ্যে নেই। সুতরাং ইংরেজি চর্চা বন্ধ করার সময় এখনও আসেনি।

একমাত্র আরবি-ফার্সি শব্দের বেলা অনায়াসে বলা যেতে পারে যে, এই দুই ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে আর নূতন শব্দ বাংলাতে ঢুকবে না। পশ্চিম বাংলাতে আরবি-ফার্সি চর্চা যাবো-যাবো করছে, পূর্ব বাংলায়ও এ-সব ভাষার প্রতি তরুণ সম্প্রদায়ের কৌতূহল অতিশয় ক্ষীণ বলে তার আয়ু দীর্ঘ হবে বলে মনে হয় না এবং শেষ কথা, আরব-ইরানে অদূর ভবিষ্যতে যে হঠাৎ কোনো অভূতপূর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়ে বাংলাকে প্রভাবিত করবে তার সম্ভাবনাও নেই।

কিন্তু যে-সব আরবি-ফার্সি শব্দ বাংলাতে ঢুকে গিয়েছে তার অনেকগুলো যে আমাদের ভাষাতে আরও বহুকাল ধরে চালু থাকবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং দ্বিতীয়ত কোনো কোনো লেখক নূতন বিদেশি শব্দের সন্ধান বর্জন করে পুরোনো বাংলার—'চণ্ডী' থেকে আরম্ভ করে 'হুতোম' পর্যন্ত—অচলিত আরবি-ফার্সি শব্দ তুলে নিয়ে সেগুলো কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। কিছুদিন পূর্বেও এই এক্সপেরিমেন্ট করা অতিশয় কঠিন ছিল, কিন্তু অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্য হয়ে পুরোনো বাংলা পড়তে হয়—তারা এই সব শব্দের অনেকগুলো অনায়াসে বুঝতে পারবে বলে অচলিত অনেক আরবি-ফার্সি শব্দ নূতন মেয়াদ পাবে।

এই পরিস্থিতির সামনে জীবন্মৃত এসব শব্দের একটা নূতন খতেন নিলে ভালো হয়।

ভারতীয় মক্তব-মাদ্রাসায় যদিও প্রচুর পরিমাণে আরবি ভাষা পড়ানো হয়েছিল, তবু কার্যত দেখা গেল ভারতীয় আর্যগণ ইরানি আর্য সাহিত্য অর্থাৎ ফার্সির সৌন্দর্যে অভিভূত হলেন বেশি। উর্দু সাহিত্যের মূল সুর তাই ফার্সির সঙ্গে বাঁধা—আরবির সঙ্গে নয়। হিন্দি গদ্যের উপরও বাইরের যে প্রভাব পড়েছে সেটা ফার্সি—আরবি নয়।

একদা ইরানে যে রকম আর্য ইরানি ভাষা ও সেমিতি আরবি ভাষার সংঘর্ষে নবীন ফার্সি জন্মগ্রহণ করেছিল, ভারতবর্ষে সেই সংঘর্ষের ফলে সিন্ধি, উর্দু ও কাশ্মীরি সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আরবির এই সংঘর্ষ ফার্সির মাধ্যমে ঘটেছিল বলে কিংবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, ভারতবর্ষীয় এ তিন ভাষা ফার্সির মতো নব নব সৃষ্টি দিয়ে ঐশ্বর্যশালী সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারল না। উর্দুতে কবি ইকবালই এ তত্ত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ও নূতন সৃষ্টির চেষ্টা করে উর্দুকে ফার্সির অনুকরণ থেকে কিঞ্চিৎ নিষ্কৃতি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি তার পদাবলি কীর্তনে। এ সাহিত্যের প্রাণ এবং দেহ উভয়ই খাঁটি বাঙালি। এ সাহিত্যে শুধু যে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বাংলায় খাঁটি কানুরূপ ধারণ করেছেন তাই নয়, শ্রীমতী শ্রীরাধাও যে একেবারে খাঁটি বাঙালি মেয়ে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভাটিয়ালির নায়িকা, বাউলের ভক্ত, মুরশিদিয়ার আশিক ও পদাবলির শ্রীরাধা একই চরিত্র একই রূপে প্রকাশ পেয়েছেন।

বাঙালির চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যমান। তার অর্থ এই যে, কী রাজনীতি, কী ধর্ম, কী সাহিত্য, যখনই যেখানে সে সত্য শিব সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে তখনই সেটা গ্রহণ করতে চেয়েছে; এবং তখন কেউ 'গতানুগতিক পন্থা' 'প্রাচীন ঐতিহ্য'-এর দোহাই দিয়ে সে প্রচেষ্টায় বাধা দিতে গেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এবং তার চেয়েও বড়ো কথা,—যখন সে বিদ্রোহ উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হতে চেয়েছে, তখন তার বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ করেছে।

এ বিদ্রোহ বাঙালি হিন্দুর ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালি মুসলমানও এ কর্মে পরম তৎপর। ধর্ম বদলালেই জাতির চরিত্র বদলায় না।

(সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত)

নূতন জীবন

হিরণ্ময়ী দেবী

দেখ চেয়ে একবার　　অসীম রহস্যময়
　　অনন্ত এ বিশ্ব;
দেখ সেথা কিবা গায়　　কোন কথা বলে তোর
　　প্রতি নব দৃশ্য।...
প্রতিদিন ফুল ফুটে　　প্রতিদিন ঝরে তারা
　　ফোটে নব ফুল।
রবি অস্তাচলে যায়　　নূতন তপন আনে
　　আলোক অতুল।
একটি বিহঙ্গগীত　　চিরতরে থেমে যায়
　　শত পাখি গায়,
একটি বসন্ত যায়,　　আবার দক্ষিণে ছুটে
　　বসন্ত বায়।
একটি তারকা খসে　　আকাশের শত তারা
　　ঢালে জ্যোতি-হাসি
একটি জাহ্নবী ঢেউ　　সাগরে মিলায়ে যায়
　　আপনা বিনাশি।
হিমগিরি হতে পুন　　তটিনী বহিয়া আনে
　　নূতন জীবন,
বিরহের গীতখানি　　না হইতে অবসান
　　গাহে রে মিলন।

ঝোড়ো সাধু

মহাশ্বেতা দেবী

ট্রেনের কামরায় লোকটাকে দেখেছিল তথাগত। পুরী থেকে ফেরার সময়ে কী একটা স্টেশনে। চিল্কার কাছে ভীষণ ঝড় হয়েছে। অনেক নৌকো ডুবেছে। অনেক গাছপালা বাড়িঘর তছনছ হয়েছে। সে কথাই সবাই বলাবলি করছিল।

লোকটার বয়স কত, তা বোঝা যায় না। একটা পোঁটলা নিয়ে সে উঠল। দরজার কাছে দাঁড়াল। তথাগতকে অবাক করে টিকেট চেকার বললেন, ‘ওখানেই থাকো সাধু। ঝড় উঠলে ট্রেন থামিয়ে দেবো।’

‘এখন আর হবে না বাবু।’

চেকার বিড়বিড় করে বললেন, ‘অপয়া!’

‘হ্যাঁ বাবু।’

‘দোষটা কাটাতে পারছ না?’

‘খোঁজ পাচ্ছি না যে।’

‘চিল্কাতে আছে বলে শুনেছিলে?’

‘হ্যাঁ বাবু।’

‘এখন কোথায় যাচ্ছ?’

‘একটা দ্বীপ খুঁজছি।’

‘দ্বীপ?’

‘হ্যাঁ বাবু। নির্জন ছোটো ছোটো দ্বীপের মধ্যে মানুষজন থাকে না! সেখানে গিয়ে থাকব। ঝড় হলে আমার ক্ষতি হবে। মানুষ কষ্ট পাবে না।’

‘বটে! নৌকো ডুববে না?’

‘তাও তো বটে।’

চেকার চলে গেলে তথাগত লোকটার সঙ্গে আলাপ করেছিল। মাধ্যমিক দিয়ে ওরা কয়েকজন বন্ধু পুরীতে এক বন্ধুর মামাবাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। দিন চারেক যেতে-না-যেতে ফিরে যেতে হচ্ছে। মায়ের খুব অসুখ। মনে দুশ্চিন্তা নিয়ে যাচ্ছে। ফলে ট্রেনে ঘুম হচ্ছে না।

কিছুতেই লোকটা মুখ খুলতে চায় না। অনেক তোয়াজ করার পর সে একটি অবিশ্বাস্য কাহিনি বলে।

ওর দেশ ময়ূরভঞ্জে। বাংলা ও ভালোই জানে। নৌকো তৈরি ছিল ওর কাজ। আর সেজন্যেই ও ওড়িশা ও মেদিনীপুরের মাঝামাঝি কোনো জায়গায় গিয়ে পড়ে। সেখানে ও খবর পায় এক বুড়ো জেলের। যাকে সবাই ভয় করত। সে নাকি ঝড় তুলতে পারত। জল, ঝড়ের দানোরা ছিল ওর বশ।

এমন একটা কথা শুনে ওর পেছন পেছন ঘুরতে থাকে। লোকটা বলেছিল, ‘না না, এ বিদ্যে শেখাব না। ঝড় তুলতে শিখলে, ঝড় থামাতেও শিখতে হবে। ওটা না শিখলে দানোরা তোমার সঙ্গে ফিরবে আর তুমি যেখানে যাবে সেখানে ঝড় উঠবে নিদারুণ।’

দুটো বিদ্যে একসঙ্গেই শিখতে হয়। অনেক সাধ্যসাধনার পর লোকটা সাধুকে নিয়ে যায় এক নির্জন সমুদ্রতীরে। ও বারবার বলেছিল, ‘দুটো শিখে নেবে। তারপর পরখ কোরো। নইলে ঝড় তোমায় ছাড়বে না। থামাবার বিদ্যে জান না। থামাতেও পারবে না।’

নির্জন সমুদ্রতীর ছিল। বালির ওপর কীসব আঁকিবুকি কেটে লোকটা সাধুকে মন্ত্র শেখাতে শুরু করে।

সাধুকে সে দ্বিতীয় মন্ত্রটা শেখাবে, তার আগেই সাধু সব সতর্কতা ভুলে মনে মনে মন্ত্রটা উচ্চারণ করেছিল। লোকটা ধাপ্পা দিচ্ছে, না সত্যি কথা বলছে, তা দেখতে হবে না?

যেমন বলা, সেই যে ঝড় উঠল, সে একেবারে রাক্ষুসে ঝড়। সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে আছড়ে পড়ল ওদের ওপর। ভয়ে সাধু জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান হতে দেখে যে, সে লোকটার পাত্তা নেই। সে একা পড়ে আছে। এসব কথা জানাজানি হলে আশপাশের লোকজন ওকে মেরে ফেলত বোধ হয়। সাধু ওখানে থেকে পালাল।

সাধু বলল, ‘সেই থেকে যারা জানে তারা আমাকে ঝোড়ো সাধু বলে বাবু! এই চেকারবাবু জানবে। আমি ট্রেনে যাচ্ছিলাম, ঝড় উঠে ট্রেন থামাতে হয়েছিল তো! কত জায়গায় কত সর্বনাশ হচ্ছে বাবু, আমার কোনো

ক্ষতি দানোরা করে না।'

'তুমি দ্বীপ খুঁজে বেড়াচ্ছ?'

হ্যাঁ বাবু। এমন জায়গায় যেতে চাই, যেখানে কোনো মানুষজন থাকে না। সেখানে পড়ে থাকব। না খেয়ে মরে যাব। যা হবার, আমার হবে। এমন কোনো জায়গার হদিস দিতে পার আমাকে?

'আমি তো জানি না।'

'বুড়োরাই বলতে পারে না। তুমি তো ছেলেমানুষ। কোথায় যে যাই?'

'ঝড় আসছে, তা তুমি বোঝ?'

'হ্যাঁ বাবু। শরীর অস্থির করে তো।'

'তোমার কেউ নেই?'

'আছে তো। তাদের কাছে যেতে ইচ্ছে করে, আবার ভয় করে। ক্যানিং-এ আমার দাদা থাকে। বারবার বলছে যে এসো। আমার কাছে থাকো। বনগাঁর আমার এক ভাগ্নে মিষ্টির দোকান খুলেছে গাইঘাটায়।'

'তুমি ওসব জায়গা চেন?'

'খুব চিনি।'

'এখন কোথায় যাচ্ছ?'

'কালীঘাটে একটা ভিখিরি থাকে। সে নাকি দানো ছাড়াতে পারে। তাই যাচ্ছি।'

হাওড়া পৌঁছে লোকটা টুপ করে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। তথাগতও ক্রমে ওর কথা ভুলে গেল।

১৯৮২ সালে সুন্দরবনের দিকে প্রচণ্ড ঝড়ের কথা সম্ভবত তোমরা ভুলে গেছ।

সে সময়ে তথাগত ডায়মন্ডহারবার শহরে বসে ছিল। মা গিয়েছিলেন মামাবাড়ি ডায়মন্ডহারবারে। তাঁকে আনতে গিয়েছিল তথাগত। মামাবাড়ির আবদার খাবে। সজনেখালি—বকখালি বেড়াবে, এমন কত পরিকল্পনা। সবই ভেস্তে গেল। মামা মৎস্যউন্নয়ন বিভাগে বড়োদরের অফিসার। তিনি তাঁর দপ্তরের নৌকো, লঞ্চ, সব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ছোটাছুটিতে।

ডায়মন্ডহারবার স্টেশনেই একটা লোক অত্যন্ত বিষণ্ন মুখে মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল। তাকে দেখেই তথাগত চমকে উঠল। হ্যাঁ, সেই ঝোড়ো সাধু। সেই কাঁচাপাকা কোঁকড়া চুল, গলায় তুলসীমালা, চোখে সেই করুণ চাহনি।

'তুমি এখানে?'

'আপনি ... আপনি ... ও! তুমি তো সেই বাবু। রাতে রেলগাড়িতে দেখা হয়েছিল। হ্যাঁ বাবু, আমি! দাদার অসুখ শুনে দেখতে গেলাম, তা সকলকে সর্বনাশ করে এলাম ... বাবু, খোকাবাবু! আমাকে ঠেলা দিয়ে রেলগাড়ির নীচে ফেলে দিতে পার?' একথা বলে ও কাঁদতে লাগল।

তথাগত বলল, 'তুমি কলকাতায় আমাদের বাড়ি এসো। আমি তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব?'

'কোথায় খোকাবাবু?'

‘আমার মাস্টারমশাইয়ের দাদা তোমার এ ব্যাপারটা ... বুঝলে সাধুদা! একটা ক্ষমতা তো?’

সাধু কেমন অবাক হয়ে গেল। বলল, ‘তুমি আমার নাম মনে রেখেছ খোকাবাবু! তুমি আমায় দাদা বললে!’

‘ও কী, চোখে জল!’

‘কেউ বলে না খোকাবাবু। সবাই বলে তুই ঝোড়ো, তুই অপয়া, সবাই ... বিস্কুট খাবে খোকাবাবু?’

‘না সাধুদা। আমার ট্রেন আসছে। তুমি এসো কিন্তু। আমার ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। এসো কিন্তু।’

‘খোকাবাবু! তোমার সেই মাস্টারমশাইয়ের দাদা আমাকে একটা নির্জন দ্বীপ খুঁজে দিতে পারবে না?’

‘দ্বীপের খোঁজ নিশ্চয়ই দেবে। তোমাকে একলা ছাড়বে নাকি? তোমার সঙ্গে অনেক লোক থাকবে, কত বিজ্ঞানী, কত পণ্ডিত, তারা দেখবে ব্যাপারটা।’

‘কিন্তু...’

বলতে বলতে ট্রেন এসে গিয়েছিল। সাধু যে আরও কী বলতে যাচ্ছিল, তা শোনা হয়নি তথাগতের। তবে ট্রেনের জানলা থেকে ও দেখেছিল, সাধু ওর দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে। তার মুখটা খুব হাসি হাসি।

কলকাতায় ও ওর মাস্টারমশাইয়ের দাদার সঙ্গে কথা বলেছিল। ভূমিকম্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডক্টর দেবেন্দু রায়ের নাম কে না জানে। তিনি বলেছিলেন, ‘লোকটাকে বেশ দেখতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য মনে হচ্ছে ওর উপস্থিত থাকা আর ঝড় ওঠার ব্যাপারটা নেহাত অস্বাভাবিক যোগাযোগ। এসব জাদু-বিশ্বাস আগে খুব ছিল। রবার্ট লুই স্টিভেনসন এমন বিশ্বাস নিয়ে গল্প লিখেছেন। আর. এম. আর. জেমসের নাম কে না জানে। তিনিও লিখেছেন।’

সাধু কিন্তু এসেছিল। ও কোনো বাড়িতে আসতে রাজি হয়নি। না, ফাঁকা জায়গাই ভালো। অবশেষে দক্ষিণ কলকাতার বিবেকানন্দ পার্কে সন্ধেবেলা সবাই এসেছিল। দেবেন্দু রায়, মেঘ বিশেষজ্ঞ চিন্তামণি নরসিংহ, আবহাওয়াবিশারদ ড. মণিময় দত্ত—কলকাতাকে তুচ্ছ ভেবো না। এ শহরে অনেক গুণী, অনেক জ্ঞানী থাকেন। এঁদের সঙ্গে ছিল এক তরুণ সাংবাদিক মোহন প্যাটেল। সে-ই ছিল সবচেয়ে অবিশ্বাসী। মজা দেখতে এসেছে, এমনি ভাব তার।

সাধু এসে বসল। সন্ধে হয় হয় নির্মেঘ আকাশ। দক্ষিণে সাদার্ন অ্যাভিনিউ, তিন দিকে আলো ঝলমল কলকাতা। দেবেন্দু রায় কথা শুরু করলেন। তথাগত বেজায় ব্যস্ত, ‘বলো না সাধুদা, আমাকে যা যা বলেছিলে?’

সাধু সবই বলল।

শুনে সবাই চুপচাপ। সাধু আপন মনেই যেন বলল, ‘এরা তো বিশ্বাস করছে না, এরা ভাবছে সবই গাঁজা।’

মোহন প্যাটেল বলল, ‘সব ধাপ্পা।’

‘ধাপ্পা? কেন বাবু, ধাপ্পা হবে কেন? আপনারাই তো আমাকে ডেকেছেন, আমি তো আপনার হতে আসিনি।’

‘তুমি একটা ডিলিউশনে ভুগছ।’

‘বটে! ইংরিজিতে কী বললে?’

‘এ হয় না, হতে পারে না।’

সাধু খপ করে তথাগতর হাত দুটো চেপে ধরল। বলল, ‘তুমি বলো খোকাবাবু, ছোট্ট করে এদের একটু দেখাই।’

কী যে বলল সে বিড়বিড় করে, তা শোনাই গেল না। যা ঘটল, তা তথাগত জীবনে ভুলবে না। প্রচণ্ড ঝড়ে

গাছপালা সব দুলে উঠল, আর বাতাসের ধাক্কায় মানুষগুলি মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে ছড়িয়ে গেল। ঝড়টা পার্ক ছাড়িয়ে লেকের গাছপালা দুলিয়ে দক্ষিণে দৌড় মারল।

তারপর সব শান্ত, শান্ত। তথাগত শুধু বলল, 'থেমে গেল?'

'এ তো ডেকে আনা ঝড়। তাতেই থামল। কিন্তু নিজে থেকে আসে যখন, তখন থামে না। চলি খোকাবাবু।'

দেবেন্দু রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'যেতে দিয়ো না ওকে। ধরে রাখো না ওকে। ধরে রাখো। ওকে নিয়ে আমি বিদেশে যাব, লোককে দেখাব।' মোহন প্যাটেল কাতর গলায় বলল, 'আমার চশমা?'

সাধু দাঁড়াল না। চলে গেল হনহন করে।

সেই শেষ। সাধুকে আর দেখেনি তথাগত। তবে গাইঘাটার ঝড়ের কথা তো তোমরা জান। কী কাণ্ড হয়ে গেল সেখানে। কত লোক মারা পড়ল।

গাইঘাটা ঘুরে এসে মোহন প্যাটেল একটি ছবি দেখিয়েছিল তথাগতকে। গাছ বুকে নিয়ে একটি লোক মরে পড়ে আছে। মুখটা খুব প্রশান্ত, যেন হাসি হাসি।

'চিনতে পার?'

'হ্যাঁ চিনেছি।'

'গাইঘাটা গিয়েছিল কেন?'

'ওখানে ... ওর ... কে যেন থাকত...'

'ওঃ! মুখটা দেখেছ?'

'দেখলাম।'

'হাসছে কেন?'

তথাগত হাসি দিয়ে মনের বেদনা ঢেকে আস্তে বলল, 'ও মুক্তি পেয়ে গেছে, তাই হাসছে।'

তৃতীয় পাঠ

পথে প্রবাসে

অন্নদাশংকর রায়

ভারতবর্ষের মাটির ওপর থেকে শেষবারের মতো পা তুলে নিলুম আর সদ্যোজাত শিশুর মতো মায়ের সঙ্গে আমার যোগসূত্র এক মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল। একটি পদক্ষেপে যখন সমগ্র ভারতবর্ষের কক্ষচ্যুত হয়ে অনন্ত শূন্যে পা বাড়ালুম তখন যেখান থেকে পা তুলে নিলুম সেই পদ-পরিমাণ ভূমি যেন আমাকে গোটা ভারতবর্ষেরই স্পর্শ-বিরহ অনুভব করিয়ে দিচ্ছিল; প্রিয়জনের আঙুলের ডগাটুকুর স্পর্শ যেমন প্রিয়জনের সকল দেহের সম্পূর্ণ স্পর্শ অনুভব করিয়ে দেয়, এও যেন তেমনি।

জাহাজে উঠে বম্বে দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি করুণ। এত বড়ো ভারতবর্ষ এসে এতটুকু নগরপ্রান্তে ঠেকেছে, আর কয়েক মুহূর্তে ওটুকুও স্বপ্ন হবে, তখন মনে হবে আরব্য উপন্যাসের প্রদীপটা যেমন বিরাটাকার দৈত্য হয়ে আলাদিনের দৃষ্টি জুড়েছিল, ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা তেমনি মাটি জল ফুল পাখি মানুষ হয়ে আজন্ম আমার চেতনা হয়েছিল, এতদিনে আবার যেন মানচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

আর মানচিত্রে যাকে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মাঝখানে গোষ্পদের মতো দেখাত সেই এখন হয়েছে পায়ের তলার আরব সাগর, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোনো দিকে চক্ষু তার অবধি পায় না। ঢেউগুলো তার অনুচর হয়ে আমাদের জাহাজখানাকে যেন গলাধাক্কা দিতে দিতে তার চৌকাঠ পার করে দিতে চলেছে। ঋতুটার নাম বর্ষা ঋতু, মনসুনের প্রভঞ্জনাহুতি পেয়ে সমুদ্র তার শত সহস্র জিহ্বা লকলক করছে, জাহাজখানাকে একবার এদিকে কাৎ করে একবার ওদিক কাৎ করে যেন ফুটন্ত তেলে পাঁপরের মতো উল্টে পাল্টে ভাজছে।

জাহাজ টলতে টলতে চলল, আর জাহাজের অধিকাংশ যাত্রি-যাত্রিণী ডেক ছেড়ে শয্যা আশ্রয় করলেন। অসহ্য সমুদ্রপীড়ায় প্রথম তিন দিন আচ্ছন্নের মতো কাটল, কারুর সঙ্গে দেখা হবার জো ছিল না, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্যাবিনে শয্যাশায়ী। মাঝে মাঝে দু'একজন সৌভাগ্যবান দেখা দিয়ে আশ্বাসন করেন, ডেকের খবর দিয়ে যান। আর ক্যাবিন স্টুয়ার্ড খাবার দিয়ে যায়। বলা বাহুল্য জিহ্বা তা গ্রহণ করতে আপত্তি না করলেও উদর তা রক্ষণ করতে অস্বীকার করে।

ক্যাবিনে পড়ে পড়ে বমনে ও উপবাসে দিনের পর রাত রাতের পর দিন এমন দুঃখে কাটে যে, কেউ-বা ভাবে যে মরণ হলেই বাঁচি, কেউ-বা ভাবে যে মরতে আর দেরি নেই । জানিনে হরবল্লভের মতো কেউ ভাবে কি না যে, মরে তো গেছি দুর্গানাম করে কী হবে। সমুদ্রপীড়া যে কী দুঃসহ তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কেউ ধারণা করতে পারবে না। হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা',— মাথার যন্ত্রণায় অমন লোভনীয় বইও পড়তে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করে কেবল চুপ করে পড়ে থাকতে, পড়ে পড়ে আকাশ পাতাল ভাবতে।

সদ্য-দুঃখার্ত কেউ সংকল্প করে ফেললেন যে, এডেনে নেমেই দেশে ফিরে যাবেন, সমুদ্রযাত্রার দুর্ভোগ আর সইতে পারবেন না। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো এডেন থেকে দেশে ফিরে যেতে চাইলেও উঠের পিঠে চ'ড়ে মরুভূমি পেরিয়ে পারস্যের ভিতর দিয়ে ফেরবার যখন উপায় নেই তখন ফিরতে হবে সেই সমুদ্রপথেই। আমরা অনেকেই কিন্তু ঠিক ক'রে ফেললুম মার্সেল্‌সে নেমে প্যারিসের পথে লন্ডন যাব।

আরব সাগরের পরে যখন লোহিত সাগরে পড়লুম তখন সমুদ্রপীড়া বাসি হয়ে গেছে। আফ্রিকা-আরবের মধ্যবর্তী এই হ্রদতুল্য সমুদ্রটি দুর্দান্ত নয়, জাহাজে থেকে থেকে জাহাজটার ওপর মায়াও পড়ে গেছে; তখন না মনে পড়ছে দেশকে, না ধারণা করতে পারা যাচ্ছে বিদেশকে; কোথা থেকে এসেছি ভুলে গেছি, কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছিনে; তখন গতির আনন্দে কেবল ভেসে চলতেই ইচ্ছা করে, কোথাও থামবার বা নামবার সংকল্প দূর হয়ে যায়।

বিগত ও আগতের ভাবনা না ভেবে উপস্থিতের উপর দৃষ্টি ফেললুম—আপাতত আমাদের এই ভাসমান পান্থশালাটায় মন ন্যস্ত করলুম। খাওয়া -শোওয়া-খেলা-পড়া-গল্প করার যেমন বন্দোবস্ত যে-কোনো বড়ো হোটেলে থাকে এখানেও তেমনি, কেবল ক্যাবিনগুলো যা যথেষ্ট বড়ো নয়। ক্যাবিনে শুয়ে থেকে সিন্ধু-জননীর দোল খেয়ে মনে হয় খোকাদের মতো দোলনায় শুয়ে দুলছি। সমুদ্রপীড়া যেই সারল ক্যাবিনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অমনি কমলো। শোবার সময়টা ছাড়া বাকি সময়টা আমরা ডেকে কিংবা বসবার ঘরে কাটাতুম। ডেকে

চেয়ার ফেলে বসে কিংবা পায়চারি করতে করতে সমুদ্র দেখে দেখে চোখ শ্রান্ত হয়ে যায়; চারিদিকে জল আর জল, তাও নিস্তরঙ্গ, কেবল জাহাজের আশে পাশে ছাড়া ঢেউয়ের অস্তিত্ব নেই, যা আছে তা বাতাসের সোহাগ-চুম্বনে জলের হৃদয়-স্পন্দন। বসবার ঘরে অর্ধশায়িত থেকে খোশ গল্প করতে এর চেয়ে অনেক ভালো লাগে।

লোহিত সাগরের পরে ভূমধ্য সাগর, দুয়ের মাঝখানে যেন একটি সেতু ছিল, নাম সুয়েজ যোজক। এই যোজকের ঘটকালিতে এশিয়া এসে আফ্রিকার হাত ধরেছিল। সম্প্রতি হাতের জোড় খুলে দুই মহাদেশের মাঝখানে বিয়োগ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে । যার দ্বারা তা ঘটল তার নাম সুয়েজ কেনাল। সুয়েজ কেনাল একদিকে বিচ্ছেদ ঘটাল বটে, কিন্তু অন্যদিকে মিলন ঘটাল—লোহিতের সঙ্গে ভূমধ্যের মিলন যেন ভারতের সঙ্গে ইউরোপের মিলন। কলম্বাস যা পারেননি, লেসেপ্‌স্‌ তা পারলেন। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান, ঐটুকুর জন্যে ভূমধ্যের জাহাজকে লোহিতে আসতে বহু সহস্র মাইল ঘুরে আসতে হতো। মিশরের রাজারা কোন্ যুগ থেকে এর প্রতিকারের উপায় খুঁজছিলেন। উপায়টা দেখতে গেলে সুবোধ্য। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যবর্তী ভুখণ্ডটাতে গোটাকয়েক হ্রদ চিরকালই আছে, এই হ্রদগুলোকে দুই সমুদ্রের সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেই সেই জলপথ দিয়ে এক সমুদ্রের জাহাজ অন্য সমুদ্রে যেতে পায়। কল্পনাটা অনেক কাল আগের, কিন্তু সেটা কার্যে পরিণত হতে হতে গত শতাব্দীর দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। কেনালটিতে কলাকুশলতা কী পরিমাণ আছে তা স্থপতিরাই জানেন, কিন্তু অব্যবসায়ী আমরা জানি—যাঁর প্রতিভার স্পর্শমণি লেগে একটা বিরাট কল্পনা একটা বিরাট কীর্তিতে রূপান্তরিত হলো সেই ফরাসি স্থপতি লেসেপ্‌স্‌ একজন বিশ্বকর্মা—তাঁর সৃষ্টি দূরকে নিকটে এনে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করেছে। যান্ত্রিক সভ্যতার শত অপরাধ যাঁরা নিত্য স্মরণ করেন, এই ভেবে তারা একটি অপরাধ মার্জনা করুন।

সুয়েজ কেনাল আমাদের দেশের যে-কোনো ছোটো নদীর মতোই অপ্রশস্ত, এত বড়ো জোর দুখানা জাহাজ পাশাপাশি আসা যাওয়া করতে পারে, কিন্তু কেনাল যেখানে হ্রদে পড়েছে সেখানে এমন সংকীর্ণতা নেই। কেনালটির সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি দিকে নানান রকমের গাছ, যত্ন করে লাগানো, যত্ন করে রক্ষিত, অন্যদিকে ধু-ধু করা মাঠ, শ্যামলতার আভাসটুকুও নেই। কেনালের দুই দিকেই পাথরের পাহাড়, যেদিকে মিশর সেই দিকেই বেশি। এই পাহাড়গুলিতে যেন জাদু আছে, দেখলে মনে হয় যেন কোনো কিউবিস্ট এদের আপন খেয়ালমতো জ্যামিতিক আকার দিয়েছে আর এক-একটা পাহাড়কে এক-একটা পাথর কুঁদে গড়েছে।

কেনালটি যেখানে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে সেখানে একটি শহর দাঁড়িয়ে গেছে, নাম পোর্ট সৈয়দ। জাহাজ থেকে নেমে শহরটায় বেরিয়ে আসা গেল। শহরটার বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট ফরাসি প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। কাফেতে খাবার সময় ফুটপাথের ওপর বসে খেতে হয়, রাস্তায় চলবার সময় ডানদিক ধরে চলতে হয়। পোর্ট সৈয়দ হলো নানা জাতের নানা দেশের মোসাফেরদের তীর্থস্থল—কাজেই সেখানে তীর্থের কাকের সংখ্যা নেই, ফাঁক পেলে একজনের ট্যাঁকের টাকা আর একজনের ট্যাঁকে ওঠে।

পোর্ট সৈয়দ মিশরের অঙ্গ। মিশর প্রায় স্বাধীন দেশ। ইউরোপের এত কাছে বলে ও নানা জাতের পথিক-কেন্দ্র বলে মিশরীরা ইউরোপীয়দের সঙ্গে বেশি মিশতে পেরেছে, তাদের বেশি অনুকরণ করতে শিখেছে, তাদের দেশে অনায়াসে যাওয়া আসা করতে পারছে। ফলে ইউরোপীয়দের প্রতি তাদের অপরিচয়ের ভীতি বা অতিপরিচয়ের অবজ্ঞা নেই, ইউরোপের স্বাধীন মনোবৃত্তি তাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে সঞ্চারিত হয়েছে।

পোর্ট সৈয়দ ছেড়ে আমরা ভূমধ্যসাগরে পড়লুম। শান্তশিষ্ট বলে ভূমধ্য সাগরের সুনাম আছে। প্রথম দিন-কতক চতুর ব্যবসাদারের মতো ভূমধ্যসাগর 'Honesty is the best policy' করলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভদ্রতা রক্ষা করলে না। আর একবার করে কেউ কেউ শয্যাশায়ী হলেন। অধিকাংশকেই মার্সেল্‌সে নামতেই হলো। পোর্ট সৈয়দ থেকে মার্সেল্‌স পর্যন্ত জল ছাড়া ও দুটি দৃশ্য ছাড়া দেখবার আর কিছু নেই। প্রথমটি ইটালি ও সিসিলির মাঝখানে মেসিনা প্রণালী দিয়ে যাবার সময় দুই ধারের পাহাড়ের সারি। দ্বিতীয়, স্ট্রম্বোলি আগ্নেয়গিরি কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় পাহাড়ের বুকে রাবণের চিতা।

মার্সেল্‌স্ ভূমধ্যসাগরের সেরা বন্দর ও ফরাসিদের দ্বিতীয় বড়ো শহর। ইতিহাসে এর নাম আছে, ফরাসিদের বন্দে মাতরম্ 'La Marseillaise'-এর এই নগরেই জন্ম। কাব্যে এ অঞ্চলের নাম আছে, ফরাসি সহজিয়া কবিদের (troubadour) প্রিয়ভূমি এই সেই Provence—বসন্ত যেখানে দীর্ঘস্থায়ী ও জ্যোৎস্না যেখানে স্বচ্ছ। এর পূর্ব দিকে সমুদ্রের কূলে কূলে ছোটো ছোটো অসংখ্য গ্রাম, সেই সব গ্রামে গ্রীষ্মযাপন করতে পৃথিবীর সব দেশের লোক আসে। Bandol নামক তেমনি একটি গ্রামে আমরা একটি দুপুর কাটালুম। মোটরে করে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। পাহাড়ের ওপর থেকে মার্সেল্‌স্‌কে দেখলে মনে হয় যেন সমুদ্র তাকে সাপের মতো সাতপাক জড়িয়ে বেঁধেছে। মার্সেল্‌স্ শহরটাও পাহাড় কেটে তৈরি, ওর একটা রাস্তার সঙ্গে আরেকটা রাস্তা সমতল নয়, কোনো রাস্তায় ট্রামে করে যেতে যেতে ডানদিকে মোড় ফিরলে একেবারে রসাতল, কোনো রাস্তায় চলতে চলতে বাঁদিকে বেঁকে গেলে সামনে যেন স্বর্গের সিঁড়ি। মার্সেল্‌স্‌ের অনেক রাস্তার দুধারে গাছের সারি ও তার ওপারে ফুটপাথ।

মার্সেল্‌স্ থেকে প্যারিসের রেলপথে রাত কাটল। প্যারিস থেকে রেলপথে ক্যালে, ক্যালে থেকে জলপথে ডোভার এবং ডোভার থেকে রেলপথে লন্ডন।

(নির্বাচিত অংশ)
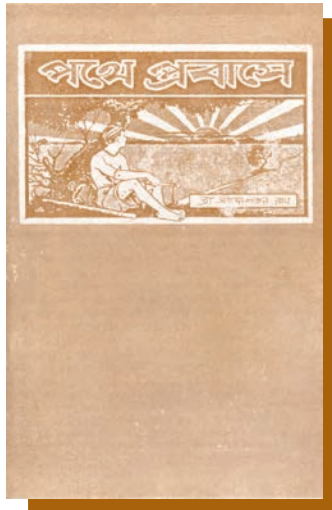
'পথে প্রবাসে'- বইটির প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ।

ঘর

অমিয় চক্রবর্তী

বাড়ি ফিরেছি।
জারুলের বেড়া; কাঁকর পথ থামবে দরজায়;
আমার পৃথিবী
এইখানে শেষ।
অনেক দেশ
চোখের তৃষ্ণায় ঘিরেছি।
অনাত্ম সংসার দূরে গরজায়।
মনের স্মৃতির ঢিবি

আজ নেই।

নূতন হতেম প্রণামে
এই
আপন ঘরের গ্রামে।
বেড়া পার হল, পা, চলো।
সিঁড়ির কাছে চেনা কচি গলার আওয়াজ;
গাছের আড়ালে, বলো
কে স্থির দাঁড়িয়ে—
আলো নিয়ে।।
ফিরে-আসার সাঁঝ।।

হিমালয় দর্শন

বেগম রোকেয়া

যথা সময় যাত্রা করিয়া শিলিগুড়ি স্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলাম। শিলিগুড়ি হইতে হিমালয় রেল রোড আরম্ভ হইয়াছে। ইস্ট ইন্ডিয়ান গাড়ির অপেক্ষা ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলগাড়ি ছোটো, হিমালয়ান রেলগাড়ি আবার তাহার অপেক্ষাও ছোটো, ক্ষুদ্র গাড়িগুলি খেলনা গাড়ির মতো বেশ সুন্দর দেখায়। আর গাড়িগুলি খুব নীচু।—যাত্রীগণ ইচ্ছা করিলে চলিবার সময়ও অনায়াসে উঠিতে নামিতে পারেন।

আমাদের ট্রেন অনেক আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল—গাড়িগুলি 'কটাটটা'—শব্দ করিতে করিতে কখনও দক্ষিণে কখনও উত্তরে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিল। পথের দুই ধারে মনোরম দৃশ্য—কোথাও অতি উচ্চ (step) চূড়া, কোথাও নিবিড় অরণ্য।

ক্রমে আমরা সমুদ্র (sea level) হইতে তিন হাজার ফিট উচ্চে উঠিয়াছি, এখনও শীত বোধ হয় না, কিন্তু মেঘের ভেতর দিয়া চলিয়াছি। নিম্ন উপত্যকায় নির্মল শ্বেত কুজ্ঝটিকা দেখিয়া সহসা নদী বলিয়া ভ্রম জন্মে। তরু, লতা, ঘাস, পাতা—সকলই মনোহর। এত বড়ো বড়ো ঘাস আমি পূর্বে দেখি নাই। হরিদ্বর্ণ চায়ের ক্ষেত্রগুলি প্রাকৃতিক শোভা আরও শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। দূর হইতে সারি সারি চারাগুলি বড়ো সুন্দর বোধ হয়। মাঝে মাঝে মানুষের চলিবার সংকীর্ণ পথগুলি ধরণীর সীমন্তের ন্যায় দেখায়! নিবিড় শ্যামল বন বসুমতীর ঘন কেশপাশ, আর পথগুলি আঁকা বাঁকা সিঁথি!

রেলপথে অনেকগুলি জলপ্রপাত বা নির্ঝর দৃষ্টিগোচর হইল—ইহার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। কোথা হইতে আসিয়া ভীমবেগে হিমাদ্রির পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ করিতে করিতে ইহারা কোথায় চলিয়াছে! ইহাদেরই কোন একটি বিশালকায় জাহ্নবীর উৎস, একথা সহসা বিশ্বাস হয় কি? একটি বড়ো ঝরনার নিকট ট্রেন থামিল, আমরা ভাবিলাম, যাহাতে আমরা প্রাণ ভরিয়া জলপ্রবাহ দেখিতে পাই, সেই জন্য বোধহয় গাড়ি থামিয়াছে। (বাস্তবিক সেজন্য কিন্তু ট্রেন থামে নাই—অন্য কারণ ছিল। সেইখানে জল পরিবর্তন করা হইতেছিল।) যে কারণেই ট্রেন থামুক—আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইল।

এখন আমরা চারি হাজার ফিট উর্ধ্বে উঠিয়াছি, তবু শীত অনুভব করি না, কিন্তু গরমের জ্বালায় যে এতক্ষণ প্রাণ কণ্ঠাগত ছিল—সে জুলুম হইতে রক্ষা পাইলাম। অল্প অল্প বাতাস মৃদু গতিতে বহিতেছে।

অবশেষে কারসিয়ং স্টেশনে উপস্থিত হইলাম, এখানকার উচ্চতা ৪৮৬৪ ফিট।

স্টেশন হইতে আমাদের বাসা অধিক দূর নহে, শীঘ্রই আসিয়া পঁহুছিলাম। আমাদের ট্রাঙ্ক কয়টা ভ্রমক্রমে দার্জিলিঙের ঠিকানায় book করা হইয়াছিল। জিনিসপত্রের অভাবে বাসায় আসিয়াও (সন্ধ্যার পূর্বে) গৃহসুখ (at home) অনুভব করিতে পারি নাই! সন্ধ্যার ট্রেনে আমাদের ট্রাঙ্কগুলি ফিরিয়া আসিল। আমাদের দার্জিলিং যাইবার পূর্বে আমাদের জিনিসপত্র তথাকার বায়ু সেবন করিয়া চরিতার্থ হইল! পরদিন হইতে আমরা সম্পূর্ণ গৃহসুখে আছি। তাই বলি, কেবল আশ্রয় পাইলে সুখে গৃহে থাকা হয় না, আবশ্যকীয় আসবাব সরঞ্জামও চাই।

এখানে এখনও শীতের বৃদ্ধি হয় নাই, গ্রীষ্মও নাই। এ সময়কে পার্বত্য বসন্তকাল বলিলে কেমন হয়? সূর্যকিরণ প্রখর বোধ হয়। আমাদের আসিবার পর একদিন মাত্র সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল। বায়ু তো খুবই স্বাস্থ্যকর, জল নাকি খুব ভালো নহে। আমরা পানীয় জল ফিলটারে ছাঁকিয়া ব্যবহার করি। জল কিন্তু দেখিতে খুব পরিষ্কার স্বচ্ছ। কূপ নাই, নদী পুষ্করিণীও নাই—সবে ধন নির্ঝরের জল। ঝরনার সুবিমল, সুশীতল জলদর্শনে চক্ষু জুড়ায়, স্পর্শনে হস্ত জুড়ায় এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত শীতল বাতাসে, না, ঘন কুয়াশায় প্রাণ জুড়ায়!

এখানকার বায়ু পরিষ্কার ও হালকা। বায়ু এবং মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখিতে চমৎকার! এই মেঘ এদিকে আছে, ওদিক হইতে বাতাস আসিল,—মেঘখণ্ডকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। প্রতিদিন অস্তমান রবি বায়ু এবং মেঘ লইয়া মনোহর সৌন্দর্যের রাজ্য রচনা করে। পশ্চিম গগনে পাহাড়ের গায়ে তরল স্বর্ণ ঢালিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর খণ্ড খণ্ড সুকুমার মেঘগুলি সুকোমল অঙ্গে সুবর্ণ মাখিয়া বায়ুভরে ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে থাকে। ইহাদের এই তামাশা দেখিতেই আমার সময় অতিবাহিত হয়, আত্মহারা হইয়া থাকি, আমি কোনো কাজ করিতে পারি না।

মনে পড়ে একবার 'মহিলা'য় ঢেঁকির শাকের কথা পাঠ করিয়াছি। ঢেঁকি শাককে আমি ক্ষুদ্র গুল্ম বলিয়াই জানিতাম। কেবল ভূ-তত্ত্ব (Geology) গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম যে, কারবনিফেরাস যুগে বড় বড় ঢেঁকিতরু ছিল। এখন সেই ঢেঁকিতরু স্বচক্ষে দেখিলাম—ভারী আনন্দ হইল। তরুবর ২০/২৫ ফিট উচ্চ হইবে।

কোনো কোনো স্থানে খুব নিবিড় বন। সুখের বিষয় বাঘ নাই, তাই নির্ভয়ে বেড়াইতে পারি, আমরা নির্জন বন্য পথেই বেড়াইতে ভালোবাসি। সর্প এবং ছিনে জোঁক আছে। এ পর্যন্ত সর্পের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। কেবল দুই তিন বার জোঁকে রক্ত শোষণ করিয়াছে।

এদেশের স্ত্রীলোকেরা জোঁক দেখিলে ভয় পায় না। আমাদের ভুটিয়া চাকরানি 'ভালু' বলে, 'জোঁকে কি ক্ষতি করে? রক্ত শোষণ শেষ হইলে আপনিই চলিয়া যায়। ভুটিয়ানিরা সাত গজ লম্বা কাপড় ঘাঘরার মতো করিয়া

পরে, কোমরে একখণ্ড কাপড় জড়ানো থাকে, গায়ে জ্যাকেট এবং বিলাতি শাল দ্বারা মাথা ঢাকে, পৃষ্ঠে দুই এক মন বোঝা লইয়া অনায়াসে প্রস্তর-সঙ্কুল আবুড়াখাবুড়া পথ বহিয়া উচ্চে উঠে; ঐরূপ নীচেও যায়! যে পথ দেখিয়াই আমাদের সাহস 'গায়েব' হয়—সেই পথে উহারা বোঝা লইয়া অবলীলাক্রমে উঠে।

মহিলার সম্পাদক মহাশয় আমাদের সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন যে, 'রমণীজাতি দুর্বল বলিয়া তাঁহাদের নাম অবলা'। জিজ্ঞাসা করি, এই ভুটিয়ানিরাও ঐ অবলা জাতির অন্তর্গত না কি? ইহারা উদরান্নের জন্য পুরুষদের প্রত্যাশী নহে; সমভাবে উপার্জন করে। বরং অধিকাংশ স্ত্রীলোকদিগকেই পাথর বহিতে দেখি—পুরুষেরা বেশি বোঝা বহন করে না। অবলারা প্রস্তর বহিয়া লইয়া যায়। সবলেরা পথে পাথর বিছাইয়া রাস্তা প্রস্তুত করে, সে কাজে বালক বালিকরাও যোগদান করে। এখানে সবলেরা বালক বালিকার দলভুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

ভুটিয়ানিরা 'পাহাড়নি' বলিয়া আপন পরিচয় দেয়, এবং আমাদিগকে 'নীচেকা আদমি' বলে! যেন ইহাদের মতে 'নীচেকা আদমি'-ই অসভ্য! স্বভাবত ইহারা শ্রমশীলা, কার্যপ্রিয়, সাহসী ও সত্যবাদী। কিন্তু 'নীচেকা আদমি'র সংস্রবে থাকিয়া ইহারা ক্রমশ সদ্গুণরাজি হারাইতেছে। বাজারের পয়সা অল্পস্বল্প চুরি করা, দুধে জল মিশানো ইত্যাদি দোষ শিখিতেছে। আবার 'নীচেকা আদমি'র সঙ্গে বিবাহও হয়! ঐরূপে উহারা অন্যান্য জাতির সহিত মিশিতেছে।

আমাদের বাসা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে বড়ো একটা ঝরনা বহিতেছে; এখান হইতে ঐ দুগ্ধফেননিভ জলের স্রোত দেখা যায়। দিবানিশি তাহার কল্লোল গীতি শুনিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ ত্রিগুণ বেগে প্রবাহিত হয়। বলি, প্রাণটাও কেন ঐ নির্ঝরের ন্যায় বহিয়া গিয়া পরমেশ্বরের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়ে না?

অধিক কী বলিব, আমি পাহাড়ে আসিয়া অত্যন্ত সুখী এবং ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছি। সমুদ্রের সামান্য নমুনা, অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর দেখিয়াছি, বাকি ছিল পর্বতের একটি নমুনা দেখা। এখন সে সাধও পূর্ণ হইল।

না, সাধ তো মিটে নাই! যত দেখি, ততই দর্শন পিপাসা শতগুণ বাড়ে! কিন্তু কেবল দুইটি চক্ষু দিয়াছেন, তাহা দ্বারা কত দেখিব? প্রভু অনেকগুলি চক্ষু দেন নাই কেন? যত দেখি, যত ভাবি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। প্রত্যেকটি উচ্চশৃঙ্গ, প্রত্যেকটি ঝরনা প্রথমে যেন বলে, আমায় দেখ! আমায় দেখ! যখন তাহাকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে দেখি, তখন তাহারা ঈষৎ হাস্যে ভ্রূকুটি করিয়া বলে, আমাকে কী দেখ? আমার স্রষ্টাকে স্মরণ করো! ঠিক কথা। চিত্র দেখিয়া চিত্রকরের নৈপুণ্য বুঝা যায়। নতুবা নাম শুনিয়া কে কাহাকে চিনে? আমাদের জন্য হিমালয়ের এই পাদদেশটুকু কত বৃহৎ, কত বিস্তৃত—কী মহান! আর সেই মহাশিল্পীর সৃষ্ট জগতে হিমালয় কত ক্ষুদ্র! বালুকাকণা বলিলেও বড়ো বলা হয়!

আমাদের এমন সুন্দর চক্ষু, কর্ণ, মন লইয়া যদি আমরা স্রষ্টার গুণকীর্তন না করি, তবে কি কৃতঘ্নতা হয় না? মন, মস্তিষ্ক, প্রাণ সব লইয়া উপাসনা করিলে, তবে তৃপ্তি হয়। কেবল টিয়াপাখির মতো কণ্ঠস্থ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে (অন্তত আমার মতে) উপাসনা হয় না। তদ্রূপ উপাসনায় প্রাণের আবেগ থাকে কই? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনকালে মন প্রাণ স্বতঃই সমস্বরে বলিয়া উঠে, 'ঈশ্বরই প্রশংসার যোগ্য। তিনিই ধন্য!' তখন এসব কথা মুখে উচ্চারণের প্রয়োজনও হয় না।

(সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত)

নোঙর

অজিত দত্ত

পাড়ি দিতে দূর সিন্ধুপারে
নোঙর গিয়েছে পড়ে তটের কিনারে।
সারারাত মিছে দাঁড় টানি,
মিছে দাঁড় টানি।
জোয়ারের ঢেউগুলি ফুলে ফুলে ওঠে,
এ-তরীতে মাথা ঠুকে সমুদ্রের দিকে তারা ছোটে।
তারপর ভাঁটার শোষণ
স্রোতের প্রবল প্রাণ করে আহরণ।
জোয়ার-ভাঁটায় বাঁধা এ-তটের কাছে
আমার বাণিজ্য-তরী বাঁধা পড়ে আছে।
যতই না দাঁড় টানি, যতই মাস্তুলে বাঁধি পাল,
নোঙরের কাছি বাঁধা তবু এ নৌকা চিরকাল।
নিস্তব্ধ মুহূর্তগুলি সাগরগর্জনে ওঠে কেঁপে,
স্রোতের বিদ্রুপ শুনি প্রতিবার দাঁড়ের নিক্ষেপে।
যতই তারার দিকে চেয়ে করি দিকের নিশানা
ততই বিরামহীন এই দাঁড় টানা।

তরী ভরা পণ্য নিয়ে পাড়ি দিতে সপ্তসিন্ধুপারে,
নোঙর কখন জানি পড়ে গেছে তটের কিনারে।
সারারাত তবু দাঁড় টানি,
তবু দাঁড় টানি।।

চতুর্থ পাঠ

পালামৌ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেকালের হরকরা নামক ইংরেজি পত্রিকায় দেখিতাম, কোনো একজন মিলিটারি সাহেব ‘পেরেড’ বৃত্তান্ত, ‘ব্যান্ডেল’ বাদ্যচর্চা প্রভৃতি নানা কথা পালামৌ হইতে লিখিতেন। আমি তখন ভাবিতাম, পালামৌ প্রবল শহর, সাহেবসমাকীর্ণ সুখের স্থান। তখন জানিতাম না যে, পালামৌ শহর নহে, একটি প্রকাণ্ড পরগনামাত্র। শহর সে অঞ্চলেই নাই, নগর দূরে থাকুক, তথায় একখানি গণ্ডগ্রামও নাই, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

পাহাড় আর জঙ্গল বলিলে কে কী অনুভব করেন বলিতে পারি না। যাঁহারা ‘কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার কৃত’ পাহাড় দেখিয়াছেন, আর যাঁহাদের গৃহপার্শ্বে শৃগালশ্রান্তি-সংবাহক ভাটভেরান্ডার জঙ্গল আছে, তাঁহারা যে এ কথা সমগ্র অনুভব করিয়া লইবেন, ইহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য পাঠকের জন্য সেই পাহাড় জঙ্গলের কথা কিঞ্চিৎ উত্থাপন করা আবশ্যক। সকলের অনুভবশক্তি তো সমান নহে।

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দেশমতো দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন মর্ত্যে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব, এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌঁছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম।

পরে চারি পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পালকি হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট চেনা যাইতে লাগিল; কিন্তু জঙ্গল ভালো চেনা গেল না। তাহার পর আরও দুই এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে, তাম্রাভ অরণ্য চারি দিকে দেখা যাইতে লাগিল।... শেষ আরও কতক দূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে, সর্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।

পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী, গ্রাম, সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় না। পালামৌ পরগনায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়; যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। আবার বোধ হয় যেন অবনীর অন্তরাগ্নি একদিনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধ হয় যেন দেখিয়াছিলাম, সকল তরঙ্গগুলি পূর্ব দিক হইতে উঠিয়াছিল, কোনো কোনোটি পূর্ব দিক হইতে উঠিয়া পশ্চিম দিকে নামে নাই। এইরূপ অর্ধপাহাড় লাতেহার গ্রামপার্শ্বে একটি আছে, আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই পাহাড়ের পশ্চিম ভাগে মৃত্তিকা নাই। সুতরাং তাহার অন্তরস্থ সকল স্তর দেখা যায়, এক স্তরে নুড়ি, আর এক স্তরে কাল পাথর, ইত্যাদি। কিন্তু কোনো স্তরই সমসূত্র নহে, প্রত্যেকটি কোথাও উঠিয়াছে, কোথায়ও নামিয়াছে। আমি তাহা পূর্বে লক্ষ করি নাই, লক্ষ করিবার কারণ পরে ঘটিয়াছিল। একদিন অপরাহ্ণে এই পাহাড়ের মূলে দাঁড়াইয়া আছি, এমত সময় আমার একটা নেমোকহারাম ফরাসিস কুক্কুর (poodle) আপন ইচ্ছামতো তাঁবুতে চলিয়া গেল, আমি রাগত হইয়া চিৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলাম। আমার পশ্চাতে সেই চিৎকার অত্যাশ্চর্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চিৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্বমত হ্রস্ব দীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। আবার চিৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ববৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চ নীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম, শব্দ কোনো একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়; সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে, শব্দও সেখানে উঠিতে নামিতে থাকে। কিন্তু শব্দ দীর্ঘকাল কেন স্থায়ী হয়, যত দূর পর্যন্ত সেই স্তরটি

আছে, তত দূর পর্যন্ত কেন যায়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ঠিক যেন সেই স্তরটি শব্দ কন্ডাক্টর (conductor); যে পর্যন্ত ননকন্‌ডাক্টরের সঙ্গে সংস্পর্শ না হয়, সে পর্যন্ত শব্দ ছুটিতে থাকে।

আর একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই, সমুদয় পরিষ্কার ঝর্‌ঝর্‌ করিতেছে। তাহার এক স্থান অনেক দূর পর্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর বৃহৎ এক অশ্বত্থগাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইয়াছিল, অশ্বত্থবৃক্ষ বড়ো রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রস গ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থগাছ আমার মনে পড়িয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম, বৃক্ষটি বড়ো শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই। এখন বোধ হয় অশ্বত্থগাছটি আপন অবস্থানুরূপ কার্য করিতেছে; সকল বৃক্ষই যে বাংলার রসপূর্ণ কোমল ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিনা কষ্টে কাল যাপন করিবে, এমন সম্ভব নহে। যাহার ভাগ্যে কঠিন পাষাণ, পাষাণই তাহার অবলম্বন। এখন আমি অশ্বত্থটির প্রশংসা করি।

এক্ষণে সে সকল কথা যাউক, প্রথম দিনের কথা দুই একটি বলি। অপরাহ্ণে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্বস্থ পর্বতশ্রেণি দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সংকীর্ণ গো-পথ দিয়া আমার পালকি চলিতে লাগিল, অনেক স্থলে উভয়পার্শ্বস্থ লতা পল্লব পালকি স্পর্শ করিতে লাগিল। বনবর্ণনায় যেরূপ "শাল তাল তমাল হিন্তাল" শুনিয়াছিলাম, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাল হিন্তাল একেবারেই নাই, কেবল শালবন, অন্য বন্য গাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশি কদম্ববৃক্ষের মতো, না হয় কিছু বড়ো, কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথাও তাহার ছেদ নাই, এই জন্য ভয়ানক। মধ্যে মধ্যে যে ছেদ আছে, তাহা অতি সামান্য। এইরূপ বন দিয়া যাইতে যাইতে এক স্থানে হঠাৎ কাষ্ঠঘণ্টার বিষণ্ণকর শব্দ কর্ণগোচর হইল, কাষ্ঠঘণ্টা পূর্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত পশু বনে পথ হারাইলে, শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হয়; এই জন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি। কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দে আরও যেন অবসন্ন করে; কিন্তু সকলকে করে কি না তাহা বলিতে পারি না।

পরে দেখিলাম, একটি মহিষ সভয়ে মুখ তুলিয়া আমার পালকির প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহার গলায় কাষ্ঠঘণ্টা ঝুলিতেছে। আমি ভাবিলাম, পালিত মহিষ যখন নিকটে, তখন গ্রাম আর দূরে নহে। অল্প বিলম্বেই অর্ধশুষ্ক তৃণাবৃত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল, এখানে সেখানে দুই একটি মধু বা মৌয়াবৃক্ষ ভিন্ন সে প্রান্তরে গুল্ম কি লতা কিছুই নাই, সর্বত্র অতি পরিষ্কার। পর্বতচ্ছায়ায় সে প্রান্তর আরও রম্য হইয়াছে; তথায় কতকগুলি কোলবালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখনও দেখি নাই; সকলের গলায় পুঁতির সাতনরী, ধুকধুকির পরিবর্তে এক একখানি গোল আরসি; পরিধানে ধড়া; কর্ণে বনফুল, কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে; কেহ বা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া আছে; কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। সকলগুলিই যেন কৃষ্ণঠাকুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।...

(সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত)

খেয়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খেয়ানৌকা পারাপার করে নদীস্রোতে;
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।
দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানাশোনা,
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।
পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস–
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে!
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা–
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা!
শুধু হেথা দুই তীরে, কেবা জানে নাম,
দোঁহা-পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে–
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।।

আকাশে সাতটি তারা

জীবনানন্দ দাশ

আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে
বসে থাকি; কামরাঙা-লাল মেঘ যেন মৃত মনিয়ার মতো
গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে—আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা—কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে;
আমার চোখের 'পরে আমার মুখের 'পরে চুল তার ভাসে;
পৃথিবীর কোনো পথ এ কন্যারে দেখে নি কো—দেখি নাই অত
অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত,
জানি নাই এত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে রূপসীর চুলের বিন্যাসে

পৃথিবীর কোনো পথে : নরম ধানের গন্ধ—কলমীর ঘ্রাণ,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা-সরপুঁটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চালধোয়া ভিজে হাত—শীত হাতখান,
কিশোরের পায়ে-দলা মুথাঘাস—লাল লাল বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা—এরই মাঝে বাংলার প্রাণ;
আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি পাই টের।

বর্ষা

প্রমথ চৌধুরী

এমন দিনে কি লিখতে মন যায়?

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, যে দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমগ্র আকাশ বর্ষায় ভরে গিয়েছে। মাথার উপর থেকে অবিরাম অবিরল অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির ধারা পড়ছে। সে ধারা এত সূক্ষ্ম নয় যে চোখ এড়িয়ে যায়, অথচ এত স্থূলও নয় যে তা চোখ জুড়ে থাকে। আর কানে আসছে তার একটানা আওয়াজ; সে আওয়াজ কখনও মনে হয় নদীর কুলুধ্বনি, কখনও মনে হয় তা পাতার মর্মর। আসলে তা একসঙ্গে ও দুই-ই; কেননা আজকের দিনে জলের স্বর ও বাতাসের স্বর দুই মিলে-মিশে এক সুর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন দিনে মানুষ যে অন্যমনস্ক হয় তার কারণ তার সকল মন তার চোখ আর কানে এসে ভর করে। আমাদের এই চোখ-পোড়ানো আলোর দেশে বর্ষার আকাশ আমাদের চোখে কী যে অপূর্ব স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দেয় তা বাঙালি মাত্রেই জানে। আজকের আকাশ দেখে মনে হয়, ছায়ার রঙের কোনো পাখির পালক দিয়ে বর্ষা তাকে আগাগোড়া মুড়িয়ে দিয়েছে, তাই তার স্পর্শ আমাদের চোখের কাছে এত নরম, এত মোলায়েম।

তারপর চেয়ে দেখি গাছপালা মাঠঘাট সবারই ভিতর যেন একটা নূতন প্রাণের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। সে প্রাণের আনন্দে নারকেল গাছগুলো সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে, আর তাদের মাথার ঝাঁকড়া চুল কখনও-বা এলিয়ে পড়ছে, কখনও-বা জড়িয়ে যাচ্ছে। আর পাতার চাপে যেসব গাছের ডাল দেখা যায় না, সেসব গাছের পাতার দল এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, পরস্পর কোলাকুলি করছে; কখনও-বা বাতাসের স্পর্শে বেঁকে-চুরে এমন আকার ধারণ করছে যে দেখলে মনে হয় বৃক্ষলতা সব পত্রপুটে ফটিকজল পান করছে। আর এই খামখেয়ালি বাতাস নিজের খুশিমতো একবার পাঁচ মিনিটের জন্য লতাপাতাকে নাচিয়ে দিয়ে বৃষ্টির ধারাকে ছড়িয়ে দিয়ে আবার থেমে যাচ্ছে। তারপর আবার সে ফিরে এসে যা ক্ষণকালের জন্য স্থির ছিল তাকে আবার ছুঁয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, সে যেন জানে যে তার স্পর্শে যা-কিছু জীবন্ত অথচ শান্ত সে সবই প্রথমে কেঁপে উঠবে, তার পর ব্যতিব্যস্ত হবে, তারপর মাথা নাড়বে, তারপর হাত-পা ছুঁড়বে; আর জলের গায়ে ফুটবে পুলক আর তার মুখে শীৎকার। বৃষ্টির সঙ্গে বৃক্ষপল্লবের সঙ্গে সমীরণের এই লুকোচুরি খেলা আমি চোখ ভরে দেখছি আর কান পেতে পেতে শুনছি। মনের ভিতর আমার এখন আর কোনো ভাবনাচিন্তা নেই, আছে শুধু এমন-একটা অনুভূতি যার কোনো স্পষ্ট রূপ নেই, কোনো নির্দিষ্ট নাম নেই।

মনের এমন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কি লেখা যায়? যদি যায় তো সে কবিতা, প্রবন্ধ নয়।

আনন্দে-বিষাদে মেশানো ওই অনামিক অনুভূতির জমির উপর অনেক ছোটোখাটো ভাব মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠছে আবার মুহূর্তেই তা মিলিয়ে যাচ্ছে। এই বর্ষার দিনে কত গানের সুর আমার কানের কাছে গুনগুন করছে, কত কবিতার শ্লোক, কখনও পুরোপুরি কখনও আধখানা হয়ে, আমার মনের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে আমি ইংরেজি ভুলে গিয়েছি। যেসব কবিতা যেসব গান আজ আমার মনে পড়ছে সে সবই হয় সংস্কৃত, নয় বাংলা, নয় হিন্দি।

মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভূবশ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ

গীতগোবিন্দের এই প্রথম চরণ যে বাঙালি একবার শুনেছে চিরজীবন সে আর তা ভুলতে পারবে না। আকাশে ঘনঘটা হলেই তার কানে ও-চরণ আপনা হতেই বাজতে থাকবে। সেইসঙ্গে মনে পড়ে যাবে মনের কত পুরোনো কথা, কত লুকানো ব্যথা। আমি ভাবছি মানুষ ভাষায় তার মনের কথা কত অল্প ব্যক্ত করে, আর কত বেশি অব্যক্ত রয়ে যায়। ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করবার জন্যই যাঁরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরাও, অর্থাৎ কবির দলও, আমার বিশ্বাস, তাঁদের মনকে অর্ধেক প্রকাশ করেছেন, অর্ধেক গোপন রেখেছেন। আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরোনো গানের প্রথম ছত্রটি ঘুরে ফিরে ক্রমান্বয়ে আমার কানে আসছে—'এমন দিনে তারে বলা যায়'। এমন দিনে যা বলা যায় তা হয়তো রবীন্দ্রনাথও আজ পর্যন্ত বলেননি, শেক্স্‌পিয়রও বলেননি। বলেন যে নি, সে ভালোই করেছেন। কবি যা ব্যক্ত করেন তার ভিতর যদি এই অব্যক্তের ইঙ্গিত না থাকে তা হলে তাঁর কবিতার ভিতর কোনো mystery থাকে না, আর যে কথার ভিতর mystery নেই, তা কবিতা নয়—পদ্য হতে পারে।

সে যাই হোক, আজ আমার কানে শুধু রবীন্দ্রনাথের গানের সুর লেগে নেই, সেইসঙ্গে তিনি বর্ষার যে অসংখ্য ছবি এঁকেছেন সেইসব চিত্র বায়োস্কোপের ছবির মতো আমার চোখের সুমুখ দিয়ে একটির পর আর-একটি চলে যাচ্ছে। ভালো কথা—এটা কখনও ভেবে দেখেছেন যে, বাংলার বর্ষা রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন, ও-ঋতুর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের ভারতী ভরপুর, তার ভীমমূর্তি আর তার কান্তমূর্তি, দুইই তাঁর

চোখে ধরা পড়েছে, দুইই তাঁর ভাষায় সমান সাকার হয়ে উঠেছে? নবাবি আমলের বাঙালি কবিরা এ ঋতুকে হয় উপেক্ষা করেছেন, নয় তাকে তেমন আমল দেননি। চণ্ডীদাসের কবিতায় কি বর্ষার স্থান আছে? আমার তো তা মনে হয় না। হয়তো বীরভূমে সেকালে বৃষ্টি হতো না, তাই তিনি ও-ঋতুর বর্ণনা করেননি। বাকি বৈষ্ণব কবিরাও এ বিষয়ে একরূপ নীরব। অবশ্য ঝড়বৃষ্টি না হলে অভিসার করা চলে না, সুতরাং অভিসারের খাতিরে তাঁদের কাব্যেও মেঘবজ্রবিদ্যুতের একটু-আধটু চেহারা দেখাতে হয়েছে; অর্থাৎ ও ক্ষেত্রে বর্ষা এসেছে নিতান্ত আনুষঙ্গিক ভাবে। অবশ্য এ বিষয়ে সেকালের একটা কবিতা আছে যা একাই একশো—

রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।।

সংগীত হিসেবে এ কবিতা গীতগোবিন্দের তুল্য। আর কাব্য হিসেবে তার অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

এখন আমার কথা এই যে, আজ আমার মনের ভিতর দিয়ে যেসব কথা আনাগোনা করছে সেসব এতই বিচ্ছিন্ন এতই এলোমেলো যে, সেসব যদি ভাষায় ধরে তারপর লেখায় পুরে দেওয়া যায় তা হলে আমার প্রবন্ধ এতই বিশৃঙ্খল হবে যে, পাঠক তার মধ্যে ভাবের গোলকধাঁধায় পড়ে যাবেন। বাইরের ল অ্যান্ড অর্ডারকে আমরা যতই বিদ্রুপ করি, ভাবের ল অ্যান্ড অর্ডারকে না মান্য করে আমরা সাহিত্য তো মাথায় থাক, সংবাদপত্রেও লিখতে পারিনে। আর যদি এমন পাঠকও থাকেন যিনি বাংলাদেশের ছেলেভুলানো ছড়া-পাঁচালির অনুরূপ অসম্বন্ধ গদ্যরচনা মনের সুখে পড়তে পারেন তা হলেও আমি আজ মন খুলে লিখতে প্রস্তুত নই। অনেক কথা যা আজ মনে পড়ছে তার যা-কিছু মূল্য আছে তা আমার কাছেই আছে, অপর কারও কাছে নেই। বহুকাল-মৃত বহুকাল-বিস্মৃত কোনো শুকনো ফুলের পাপড়ি যদি হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় তা হলে যে সেটিকে এককালে সজীব অবস্থায় সাদরে সঞ্চিত করে রেখেছিল, একমাত্র তারই কাছে সে শুষ্কপুষ্পের মূল্য আছে, অপরের কাছে তা বর্ণগন্ধহীন আবর্জনা মাত্র। মানুষের স্মৃতির ভিতরও এমন অনেক শুকনো ফুল সঞ্চিত থাকে যা অপরের কাছে বার করা যায় না। কিন্তু এমন দিনে তা আবিষ্কার করা যায়।

আবার ঘোর করে এল, বাতি না জ্বালিয়ে লেখা চলে না; আর কালির অপব্যয় করা যত সহজ বাতির অপব্যয় করা তত সহজ নয়। অতএব এইখানেই এ লেখা শেষ করি।

আবহমান

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া,
লাউমাচাটার পাশে।
ছোট্ট একটা ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল
সন্ধ্যার বাতাসে।

কে এইখানে এসেছিল অনেক বছর আগে,
কে এইখানে ঘর বেঁধেছে নিবিড় অনুরাগে।
কে এইখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে,
এই মাটিকে এই হাওয়াকে আবার ভালোবাসে।
ফুরয় না তার কিছুই ফুরয় না,
নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু মুড়য় না!

যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া,
লাউমাচাটার পাশে।
ছোট্ট একটা ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল,
সন্ধ্যার বাতাসে।

ফুরয় না তার যাওয়া এবং ফুরয় না তার আসা,
ফুরয় না সেই একগুঁয়েটার দুরন্ত পিপাসা।
সারাটা দিন আপন মনে ঘাসের গন্ধ মাখে,
সারাটা রাত তারায়-তারায় স্বপ্ন এঁকে রাখে।
ফুরয় না, তার কিছুই ফুরয় না,
নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু মুড়য় না।

যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া,
লাউমাচাটার পাশে।
ছোট্ট একটা ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল,
সন্ধ্যার বাতাসে।

নেভে না তার যন্ত্রণা যে, দুঃখ হয় না বাসি,
হারায় না তার বাগান থেকে কুন্দফুলের হাসি।
তেমনি করেই সূর্য ওঠে, তেমনি করেই ছায়া
নামলে আবার ছুটে আসে সান্ধ্য নদীর হাওয়া।
ফুরয় না, তার কিছুই ফুরয় না,
নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু মুড়য় না।

যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া,
লাউমাচাটার পাশে।
এখনও সেই ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল
সন্ধ্যার বাতাসে।

উপোস

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

নোয়াখালি থেকে ফিরে মেয়েটা যেন কী হয়ে গেছে! হাসি খুশিতে ভরা, ফুলে ফুলে দুলে বেড়ানো প্রজাপতিটির মতন সে এষাই নয় যেন। মা, দিদি, ভাজ সবাই ঠাট্টা করে বলে, বুড়ো নাকি বড্ড ভালোবাসত, তাই বুড়ি করে দিয়ে গেছে! ভাজ ঠাট্টাটা আর একটু শানিয়ে দিয়ে বলে—কেন নিয়ে এলেন বাবা? টাঙিয়ে দিলেই পারতেন বুড়োর গলায়!

সত্যিই কী যেন গুণ করে দিয়ে গেছে বুড়ো! সর্বদাই তার কথা মনে পড়ে মনটা বড্ড ভার হয়ে থাকে। তার প্রথম দিন ঠাকুরদাদার সঙ্গে গিয়ে সেই যে দেখেছিল তারপর থেকে প্রত্যেক কথাটি মনে আছে এষার, প্রতি খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত। হাসি-খুশি কি একেবারেই নেই?—তা আছে, তবে তার মধ্যে সেখানকার কথা যদি একটু মনে পড়ে যায়—আর যায়ই পড়ে—ব্যস, আর কিছু ভালো লাগে না। ইচ্ছে করে জানালায় গিয়ে বসে বাইরের দিকে চেয়ে থাকি, কি বিছানায় গিয়ে চুপটি করে পাশ ফিরে পড়ে থাকি।

এষাদের এখানে কলকাতায় যেমন বাড়ি আছে, সেখানে গ্রামেও তেমনি আর একটা বাড়ি আছে, সঙ্গে বাগান, পুকুর, মাঠ, আর কলকাতার মতন এত কাপড়-জামা না-পরা কত লোক, কতো ভালো তারা! এষা এখন তো বড়ো হয়েছে, বাবা বলেন সাত বছর; মা বলেন সাত বছর পাঁচ মাস—ভারি তো জানো তুমি! এষা যখন খুকুর মতন ছোটো ছিল, তখন গিয়েছিল একবার, একটু একটু মনে পড়ে—পুকুর, মাঠ, বাগান, ...কী চমৎকার সব লোক! কী মিষ্টি না তাদের কথা!

এষার দাদু হাজিসাহেব এবারে নিয়ে যেতেন না, কী সব নাকি হয়েছে—মারামারি, ঘরে আগুন, সে-সব ছোটো মেয়েদের দেখতে নেই, শুনতেও নেই। যেতেনই না নিয়ে, গেলেন শুধু থাকতে পারবেন না বলে। দাদু এষাকে ছেড়ে একরাত্তিও যে পারেন না থাকতে। ওই জন্যেই রয়েছেন কলকাতায় এসে, নয়তো আগে গ্রামেই থাকতেন তিনি। বুড়ো যেমন এষাকে গুণ করেছে, তেমনি বলতে পারা যায় এষাও তার দাদুকে গুণ করেছে।

বুড়ো অর্থাৎ গান্ধিজি। এসেচেন উনি, পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্চেন। বনের মধ্য দিয়ে, ডোবার পাশ দিয়ে, খেতের আল ভেঙে, একটা বাঁশের নড়বড়ে পুলের ওপর দিয়ে খাল পেরিয়ে—বুঝিয়ে বেড়াচ্চেন কত তাদের ভুল, কী তাদের পাগলামি।—মনে মনে আশা এইভাবে ওঁর নিজের প্রাণটা গেলেও যদি ফেরে ওদের মতিগতি।

হাজিসাহেবের দয়ার শরীর, এর আগে কয়েকবার ঘুরে গেছেন, সফল যা হয়েছিলেন তা খুব বেশি নয়; আবার গান্ধিজি আসতে এসেচেন, মহাপুরুষের দয়ার গঙ্গাধারার সঙ্গে নিজের দয়াটুকু মিশিয়ে কিছু ফল হয় কিনা দেখতে চান। বড়ো ধার্মিক প্রকৃতির লোক হাজিসাহেব।

দিন-চারেক ওঁর সঙ্গে দেখা করে আসবার পর হাজিসাহেব একদিন রাত্তিরে এসে এষাকে বললেন—তোমায় যে গান্ধিজি নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েচেন দিদি, যাবে কি?

লজ্জার কথা—তা এমন লজ্জারই বা কি?—স্বাস্থ্যে টুলটুল হাসিখুশিতে ভরা সব ছেলেমেয়েরই অমন হয়—মানে, এষার নেমন্তন্নয় একটু লোভ আছে। হিন্দুদের বাড়িতে আবার মিষ্টির ভাগটা বেশি, লাগে ভালো। হাজিসাহেবকে জড়িয়ে বললে—যাব দাদু, কী কী হবে?

বাটিখানেক ছাগলের দুধ আর...

'ওয়াক'—শব্দ করে এষা মুখটা গোঁজ করে একটু দাঁড়িয়ে রইল, তারপর রাগ করে দাদুর হাঁটুতে একটা ছোট্ট ঘুষি মেরে বললে—যাও, ছাগলের দুধের নেমন্তন্ন তুমি খাও গে পেট ভরে, আমার দরকার নেই।

বাঃ, সে যা খায় তারই নেমন্তন্ন করবে তো?

সঙ্গে সঙ্গে ওকে কোলে তুলে নিয়ে হেসে বললেন—না রে পাগলি, খাবার নেমন্তন্ন নয়, তোকে দেখবেন, গল্প করবেন তোর সঙ্গে, তারই নেমন্তন্ন। বড্ড ভালোবাসেন যে ছোটো ছেলেমেয়েদের। তা তোর জন্য না হয় থাকবে লুচি সন্দেশের ব্যবস্থা। বলব, মহাত্মাজি, আমাদের এষারানি দেখতে পরির মতন, খিদে কিন্তু রাক্কুসির।

দাদুর পিঠে আদুরে-রাগের কিল-চড় গোটাকতক যে না পড়ল এমন নয়, তারপর কিন্তু রাজিই হলো এষা যেতে।

অনেক রাত পর্যন্ত কিন্তু ঘুমই এল না এষার চোখে। যাব তো বলে দিলে, কিন্তু কেমন লোক গান্ধিজি?—দাদারা বলে বড়ো বড়ো সায়েবরা ভয়ে কাঁপে, লাটসায়েবকে ডেকে হাত মেলাতে হয়। এষার তো সায়েব দেখেই ভয় হয়, রাঙা রাঙা প্রকাণ্ড মুখ, কটা কটা চোখ, মুখে কালো কালো এতবড়ো করে সিগরেট—সেই সায়েব আবার গান্ধিজিকে দেখে কাঁপে?

দাদু গল্প করেন। গাঁয়ের পর গাঁ, মাঠ, ঘাট, বনবাদাড় বেয়ে চলেচেন তো চলেচেনই গান্ধিজি, মনে হয় যেন লোহার শরীর! সবাই ভেট নিয়ে আসছে—কেউ বেল, কেউ নারকেল, কেউ আরও কত কী! বলছে, আর এরকম করব না, যা লোকসান করেছি সব মেরামত করে দিচ্ছি; কীরকম ভয়ংকর মানুষই না হবেন গান্ধিজি! কেন মরতে রাজি হলো এষা? ...যা খুশি তাই পারেন নাকি করতে গান্ধিজি পরিদের মতন, হিন্দুদের দেবতাদের মতন? হ্যাঁ, পারেনই তো!—ঘুমুতে ঘুমুতে এষা বেচারা যখন ঘুমে ঢুলে এসেছে, গান্ধিজি এসে হাতটা ধরে তুললেন। সত্যি কত বড়ো মানুষ রে বাবা! সায়েবরা আর ভয় পাবে না? তুলে সঙ্গে নিয়ে চললেন—বনবাদাড়, মাঠ, ঘাট, বাঁশের পুল—লোকরা চারিদিক থেকে ভেট দিচ্ছে আম, জাম, কাঁটাল, নারকেল...

একটু কীরকম হয়ে চলল এষা—ভালো-লাগা কি মন্দ-লাগা বলতে পারে না। তারপর কষ্ট হতে লাগল—পড়ে যাচ্ছে, কাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছে—পায়ে কাঁটা বিঁধছে—গা ছড়ে গিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে—ওগো আমায় ছেড়ে দাও না! আর পারছি না যে! গান্ধিজি বলছেন—না, থামলে কি চলে? —কেন মানুষে এরকম? এসো না আমাদের রক্তের নদী বইয়ে যত সব দুষ্টুদের দিই ডুবিয়ে...

ভাগ্যিস সকালে দাদুর ডাকে ঘুম ভেঙে গিয়ে এষা দেখলে ওটা শুধু স্বপ্ন!

পরদিন সন্ধের পর হাজিসাহেব এষাকে নিয়ে গেলেন গান্ধিজি যেখানে থাকেন। এষার তো ভয়ে বুকটা দুরুদুরু করচে তবুও অনেকটা ভরসার কথা, গান্ধিজির শরীরটা নাকি খারাপ আজ, সমস্ত দিন বেরুতে পারেননি। একটা ছোট্ট গরিব লোকের বাড়ি, এষাদের বাড়ির চেয়ে ঢের ঢের ছোটো, তার সামনের একটা ঘরের মধ্যে হাজিসায়েব এষাকে নিয়ে ঢুকলেন। বাইরের উঠোনে, এখানে-সেখানে অনেক লোক চুপচাপ করে বসে আছে, হাজিসায়েবকে দেখে উঠে সেলাম করলে।

ভেতরে বেশি লোক নেই। মাদুরে বসে একজন মেয়ে চরখা ঘোরাচ্চে, একজন রোগাপনা লোক একটা বই পড়চে, একজন এমনি চুপ করে বসে আছে, আর একজন বেদানা ভেঙে একটা বাটিতে জড়ো করেচে। বাড়ির ভেতরের দিকেও লোক আছে, চাপা কথাবার্তা শোনা যাচ্চে, এবার মনে হলো, ওদিককারই কোনো ঘরে গান্ধিজি শুয়ে আছেন নিশ্চয়।

হাজিসাহেব আর এষা। একটা মাদুরে বসতে যাবে, বাইরে খানিকটা দূরে হঠাৎ একটা হইচই উঠল। যারা বাইরের উঠোনে বসেছিল তারা ছুটল, তারপর যারা ঘরের মধ্যে ছিল তারাও উঠে পড়ল। দাদু এষাকে বললে, তুমি বোসো এখানে, আমি আসছি।

সবাই উঠে বেরিয়ে গেল, রইল শুধু এষা আর যে লোকটি বই পড়ছিল সে। সবাই যেদিকে গোলমাল হচ্ছিল সেদিকে ছুটে যেতে এষার ভয়-ভয় করতে লাগল। মনে হলো, তবুও যদি দাদু গান্ধিজির কাছে বসিয়ে আসত! অসুখ হলেও তাঁর গায়ে যেমন ক্ষমতা এষাকে কেউ কিছু করতে পারত না। এ লোকটা যেন কি, বই থেকে আর মুখ তোলে না, কথাও কয় না!

এষা যখন এই রকম ভাবছে, লোকটা কইলে কথা; বই থেকে একবার মুখটা তুলে বললে—খুকু, ভয় করবে না।

দেখতে ভালো না হলেও হাসিটা বেশ মিষ্টি, আর কথাটুকুও দাদুর মতনই যেন আদুরে গলা! ওইটুকু বলেই আবার সে বই পড়তে লাগল। এষা অনেকক্ষণ চুপ করে ওর দিকে চেয়ে বসে রইল। যতই দেখতে লাগল ততই যেন মনে হতে লাগল ওর সঙ্গে কথা কই একটু! কিন্তু কী কথা কইবে এষা? তারপর মনে হলো,

ঠিক তো, এই তো কথা কইবার রয়েছে! জিগ্যেস করলে—হ্যাঁগা, গান্ধিজি কোথায়?

লোকটি চেয়ে আরও মিষ্টি করে হেসে বললে—কেন? কী হোবে?

তাঁকে আমি দেখব, তাই জন্যে এসেছি।

কী হোবে দেখে?

এর উত্তর এষা কী দেবে? নেমন্তন্নর কথা বলতে লজ্জা করতে লাগল, দাদু যা ঠাট্টা করেছেন! তারপর মনে পড়ল, বললে—তাঁর নাকি অসুখ?—তাই। লোকটা চেয়ে আবার মিটি-মিটি হাসতে লাগল। এষার রাগও হচ্চে, আবার এত মিষ্টি হাসি—দাদুর চেয়েও এত মিষ্টি যে কথা কইতেও ইচ্ছে হচ্চে।

এবার কী জিগ্যেস করবে? ভেবে ভেবে আবার একটা কথা মনে হলো, জিগ্যেস করলে—হ্যাঁগা, কতবড়ো গান্ধিজি?

এই ঘোরের মোতন!—হাতটা ঘুরিয়ে লোকটা আবার এষার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।

এষা বললে—ওরে বাবা! কীসে শুয়ে আছে তাহলে?

এমন সময় আবার সবাই হইহই করতে করতে ফিরে চুপ করে এসে বসল। দাদু, আরও ঘরের সবাই ঘরে এসে বসলেন, একটা মিছে হল্লা হয়েছিল, কিছু হয়নি।

তারপর দাদু সেই বই-পড়া রোগাপনা লোকটিকে সেলাম করে বললেন—এই আমার নাতনি মহাত্মাজি! নাম আয়েষা, আমরা এষা বলে ডাকি।

এষার মনে হলো সে যেন কীরকমটা হয়ে গেছে! কী ভাবছে, কী দেখছে কিছুই বুঝতে পারছে না; হাঁ করে ঠায় লোকটার দিকে চেয়ে রইল, সে তখন আরও মিষ্টি করে মিটিমিটি হাসচে।

এরপর থেকেই খুব ভাব হয়ে গেল এষার। এত ভাব হলো যে ওঁর ওখান থেকে আসতেই ইচ্ছে হতো না, যদি কোনোদিন ওকে নিয়ে যেতে দেরি হতো দাদুর, তো তাগাদায় তাগাদায় অস্থির করে তুলত। একে তো প্রকাণ্ড নয় গান্ধিজি—তার জন্যে এমনিই ভালো লাগে, তার ওপর দাদুর মতন বুড়ো হয়েও এখন মনে হয় যেন এষাদেরই খেলার সঙ্গী।

একটা খেলা যে গান্ধিজি খেলেন সেটা এষাও শিখেছে, চরখা চরখা খেলা, গান্ধিজি নিজেই এষাকে ছোট্ট একটা গড়িয়ে দিয়েছেন, ওঁর কাছে বসে বসেই ঘোরায়, এষা বলেছে একদিন গান্ধিজিকে হারিয়ে দেবে, গান্ধিজি বলচেন উনি হেরে গেলে নিজেরটা ওকে দিয়ে দেবেন।

সেইখানে বসে বসেই কত গল্প হয় ওদের। আরও সবাই থাকে, কিন্তু এক গান্ধিজি থাকেন বলেই এষার ভয়ও হয় না, লজ্জাও করে না। আহা, গান্ধিজি সত্যি বড্ড ছেলেমানুষ! হলেনই বা দাদুর মতন বুড়ো, সেইজন্যেই না দুঃখ করে বলেন, এষাদের কথা এখনও ভালো করে শিখতে পারেননি! তা এষা বলেছে শিখিয়ে দেবে, সেইজন্যেই ওকে গল্পের বই, ছড়ার বই পড়ে শোনায়, গল্প বলে। গান্ধিজি চরখা ঘোরাতে ঘোরাতে, আর সবার সঙ্গে গল্প করতে করতে শোনেন, এক-একটা কথা জিগ্যেস করেন, এক-একটা কথা নিজেই বলে হেসে বলেন এষাকে—এই দেখো, মাস্টারমশাই, আমি শিখেছি। সবাই হাসে, গান্ধিজিও হাসেন, ওঁর হাসিটা আর কথাগুলো এত মিষ্টি লাগে এষার।

দাদু সন্ধের পর এষাকে নিয়ে যেতেন ওঁর ওখানে, যখন খাবার সময় হতো ফিরে আসতেন। গান্ধিজি গাঁয়ে-গাঁয়ে বেড়িয়ে, লোকদের শান্ত হতে বলে সন্ধের পর ফিরে আসতেন, এক-একদিন দেরি হতো ওঁর ফিরতে, সবাই চুপ করে বসে থাকত।

একদিন গিয়ে শুনলে উনি আগেই এসে গেছেন। শুধু তাই নয়, মাদুরে বসে চরখা খেলাও খেলচেন না, অন্য ঘরে বিছানায় চুপটি করে শুয়ে আছেন। সবাই বললে, আজ বেড়িয়ে এসে শরীর খারাপ হয়েছে, ডাক্তার বারণ করেছে গল্প করতে কারুর সঙ্গে। শুনে এষার মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল—মনে মনে ভগবানকে ডেকে বললে—হে ভগবান খোদাতালা, দেখিয়ে দাও, বড্ড মন কেমন করছে! না দেখতে পেলে কেঁদে ফেলব, তখন বড্ড লজ্জা করবে সবার সামনে।

গান্ধিজি বলেন—ভগবান কচি ছেলেমেয়েদের কথা খুব শুনতে পান। দেখা হবে না শুনে হাজিসায়েব আর সবার সঙ্গে গল্প করে চলে আসবেন, এমন সময় যে মেয়েটি গান্ধিজির সঙ্গে বেশি থাকে, সে এসে দাদুকে ইংরিজিতে কী বলল! বলতে দাদু এষাকে নিয়ে ভেতরে গেলেন। তারপর গান্ধিজির সঙ্গে একটু কথা কয়ে এষাকে বললেন—গান্ধিজি এষাকে থাকতে বলেছেন একটু, থাকবে কি এষা? এরপর কেউ এসে ওকে নিয়ে যাবে। এষা আবার থাকবে না? বলে—হ্যাঁরে ভাত খাবি? না, পাতা কোথায় পাতব?

গান্ধিজির ডাক্তার ওঁকে কী বললেন, উনিও একটু হেসে তাকে কী বললেন, তারপর সেও একটু হেসে চলে গেল। গান্ধিজির বিছানার পাশে একটা টুলে শুধু এষা রইল বসে।

গান্ধিজি বললেন—গোল্পো বোলো। ওঁর কথাগুলো ওইরকম একটু বাঁকা, এত মিষ্টি লাগে।

এষা জিগ্যেস করলে—কষ্ট হচ্চে তোমার?

গান্ধিজি মাথা নেড়ে বললেন—হুঁ।

আমি খোদাতালাকে বলব, ভালো করে দেবেন। হিঁদুদের ভগবানকেও বলব।

ওঁরা একই। তোমার কথা শোনেন?

হুঁ, খুব শোনেন। এই দেখো না এক্ষুনি তাঁকে বললুম, তোমায় না দেখতে পেলে আমি কেঁদে ফেলব, অমনি লোক পাঠিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে এলেন।

সত্যি? বলে গান্ধিজি মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন, তারপর একটা ঘণ্টি টিপলেন। টিং করে আওয়াজ হতেই সেই মেয়েটি এসে হাজির। তাকে কী বলতে সে আর একটি লোককে ডেকে নিয়ে এল। কারুর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে গান্ধিজি এই লোকটিকে বলেন, সে আবার তাকে বলে, গান্ধিজি অনেকখানি করে আমাদের কথা বলতে পারেন না কিনা!

দাদু বলে, এইরকম লোককে বলে দোভাষী।

গান্ধিজির কথা শুনে দোভাষী বললে—গান্ধিজি বলছেন তোমার খোদাতালাকে ওঁর কষ্ট কমাতে বোলো না যেন!

এষা আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করলে—কেন?

দোভাষী আবার শুনে বললে—বলছেন তার চেয়ে অন্য সবার কষ্ট কম করতে বোলো—এখানে যাদের বাড়িঘর গেছে, নিজের লোক মরেছে, আবার খবর পাওয়া গেছে বিহার বলে একটা জায়গা আছে, সেখানেও অনেক লোকের এই রকম কষ্ট হচ্ছে, গান্ধিজি বলেছেন—তাদের কষ্ট বন্ধ করতে বোলো তোমার খোদাতালাকে।

এষা ভয় পেয়ে বলে উঠল—ও বাবা! সে যে অনেক লোক হয়ে গেল! গান্ধিজি আর দোভাষী দুজনেই হেসে উঠলেন। গান্ধিজি এষার পিঠে হাত দিয়ে হেসে জিগ্যেস করলেন—কোষ্টো হবে খোদাতালার?

ওমা! হবে না? অনেক লোক যে!

তারপর গান্ধিজি অনেকগুলো কথা বলে দোভাষীকেই বললেন। সে এষাকে বললে—বলছেন, শুধু তাই নয়, যারা লুঠ করছে, লোক মারছে, ঘরে আগুন দিচ্ছে, তাদেরও মন ভালো করে দিতে হবে তোমার খোদাতালাকে; না হলে গান্ধিজি আরও কষ্ট করতে করতে মরে যাবেন।

এষার মুখ শুকিয়ে গেল, গান্ধিজির মাথায় হাত দিয়ে বললে—না মোরো না।

গান্ধিজি সেই রকম হেসে হেসে বললেন—নিশ্চয় মরব। কী করে? ভয়ে এষার গলা শুকিয়ে আসতে লাগল। উপোস করব।

এষা ভয়ে মুখের পানে ঠায় চেয়ে রইল, চোখ ছলছল করে উঠল, তারপর গলাটা জড়িয়ে ব্যাকুল হয়ে বললে—আচ্ছা আমি বলব খোদাতালাকে। কোরো না উপোস। না কখনও কোরো না! ...

বাড়ি এসে এষা যতক্ষণ না ঘুম না হলো আর ঘুম হয়ে যতক্ষণ স্বপ্ন দেখলে, খালি খোদাতালাকে ডাকলে। পরের দিন অসুখ বলে গান্ধিজি একেবারেই বেরুননি, এষা গিয়ে দেখলে আরও রোগা হয়ে গেছেন। বললেন, এষার খোদাতালা কিছু করেননি, খবর পাওয়া গেল লোকেরা আরও ঘর জ্বালাচ্ছে, আরও কাটাকাটি করছে, আরও লুঠ করছে এবং গান্ধিজি নিশ্চয় উপোস করে মরবেন।

এষা চোখের জলে দু-গাল ভিজিয়ে বললে—না কোরো না উপোস, কোরো না, আমি সমস্ত রাত আজ খোদাতালাকে ডাকব। এবার নিশ্চয় শুনতে পাবেন তিনি।

গান্ধিজি শুয়ে শুয়ে একটু হাসলেন, আজিমা মরবার আগে যেরকম হেসেছিলেন সেইরকম, দেখলে কষ্ট হয়।

দোভাষীর দিকে চেয়ে কী বললেন, সে এষাকে বললে—উনি বলছেন—লোকেরাও কথা শুনছে না, তোমার খোদাতালাও শুনছেন না, উনি করবেনই এবার উপোস, মরবেনই।

পরের দিন সকালেই টেলিগ্রাম পেয়ে এষাদের হঠাৎ চলে আসতে হলো। তারপর অনেক দিন হয়ে গেছে; অনেক কিছু শিখেছে এষা অনেক কিছু ভুলেছে কিন্তু সেই শেষ দেখাটির ছবি আজও ভুলতে পারেনি। কীরকম যেন হয়ে গেছে এষা! কেমন আছেন গান্ধিজি? কাউকে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয় না। শোনে নাকি ভালো আছেন, ওখান থেকে চলেও গেছেন, কিন্তু ওর মন বিশ্বাস করতে চায় না—মনে হয় সবাই যেন কাটাকাটি করছে, খোদাতালা যেন শুনছেন না, গান্ধিজি বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুকিয়ে গেছেন আরও, মুখে আজিমার মতন হাসি রয়েচে, বলেছেন এইবার মরবেন নিশ্চয় উপোস করে... কাছে নেই বলে এষার মনটা আরও হু-হু করে—কী করবে সে? এর ওপর উপোস করলে কি বাঁচবেন?...

বাড়ির লোকেরা বলে—বুড়ো কী গুণ যে করে দিলে মেয়েটাকে!

এরপর হঠাৎ একদিন কলকাতায় আবার সেই রকম হইহই উঠল—আল্লা-হো আকবর! বন্দে মাতরম্! জয় হিন্দ!

বাড়ির সবার মুখ শুকিয়ে গেল, দাদারা তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে এল, বাবা অফিস থেকে, কদিন চলল এইরকম। এষার বুকটা অষ্টপহর দুরদুর করে, নিজের জন্যে ভয়ে নয়, বাড়ির জন্যেও নয়, বাড়িতে বন্দুক আছে—দাদু, বাবা, দাদারা সবাই আছে। এষার ভয় করে গান্ধিজির জন্যে, তিনি যে উপোস করবেনই, আর কোনোমতে তাঁকে বুখতে পারা যাবে না যে, কারা সব আছে তাঁর কাছে? কী করছে তারা?

শব্দ আরও বড়ো বেশি হয়ে উঠছে চারিদিকে, ছটফট করে এষা। খোদাতালাকে এত ডাকছে, শুনছেন না কেন? এরা অনেক লোক বলে আর বড্ড দুষ্টু বলে মানা করে উঠতে পারছেন না নাকি?

তারপর একদিন বিকেলে খুবই বাড়াবাড়ি হয়ে উঠল। মনে হলো যে সমস্ত পাড়াটা ঘিরে ফেলেছে সবাই—একদিকে জয় হিন্দ আর বন্দে মাতরম্ আর একদিকে আল্লা-হো আকবর! ক্রমেই এগিয়ে আসছে। বাবা, দাদা সবাই বন্দুক লাঠি সড়কি নিয়ে জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। এষার কী হতে লাগল—এক একবার মনে হতে লাগল সে যেন গান্ধিজির মাথার কাছটিতেই রয়েছে দাঁড়িয়ে, বলছে, তুমি কোরো না উপোস—আমি আরও ডাকছি খোদাতালাকে...

বেড়ে উঠছে বন্দে মাতরম্! এগিয়ে আসচে আল্লা-হো আকবর! কী করে গো এষা? কাকে বলে... গান্ধিজি যে আর বাঁচবেনই না! ... হে ভগবান, হে খোদাতালা!... শুনছ না কেন তুমি?...

আরম্ভ হয়ে গেছে, সামনের রাস্তায়, বাড়ির নীচেই। এখনও গায়ে গায়ে ভিড়েনি, তবে বেশি দূরেও নয় দুটো দল। ঢিল, পাটকেল, সোডার বোতল, লোহার টুকরো ছুটোছুটি করছে দুদিকে। দাদারা যেন হাজারটা ব্যাডমিন্টন খেলছে একসঙ্গে...

হঠাৎ তার একরকম মাঝখানেই একটি মেয়ে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল—ছোটো ধবধবে রং, গায়ে একটা সাদা ধবধবে ফ্রক, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুলগুলো হাওয়ায় দুলছে দুটো হাত দুদিকে উঁচু করা।

পরির মতন গলা—হুকুমে মিনতিতে ভেঙে পড়ছে—হৈ-হল্লাকে উঠছে ছাপিয়ে—সেতারের বাজনা শুনেছ তো? —মুলতানের সুরটা। ঝঙ্কারে যেমন ছাপিয়ে ওঠে...

ওগো তোমরা থামো!—থামো না গো তোমরা! গান্ধিজি যে উপোস। গান্ধিজি যে আর বাঁচবেন না!... থামো না গো।...

হঠাৎ নরম হলো হল্লাটা পুরোপুরি নয়, এক পর্দা। সঙ্গে সঙ্গেই একটা কী এসে লাগল কোমরে—ঢিল নয়, বোতলের টুকরো। দেখতে দেখতে সাদা ফ্রকের ওইখানটা রক্তে রাঙা হয়ে উঠল। দেখলে না মেয়েটা, আন্দাজেই হাতটা নামিয়ে চেপে ধরলে সেখানটা। মুখ কিন্তু বন্ধ নেই—ওগো থামো না তোমরা! উপোস করবেন যে! বাঁচবেন না যে!...

লিখতে সময় লাগল, হলো কিন্তু সমস্তটা এক মিনিটের মধ্যে। সব চুপচাপ যেন সে লোকই নয় কেউ!... কী ভাবলে ওরা?— আকাশের পরি নেমে এসেছে নিজের শরীরের মধ্যে দিয়ে সবার রক্ত বইয়ে দিতে? তা নয়তো কে পারে এই মৃত্যুবর্ষণের মাঝখানে এসে এমনভাবে দাঁড়াতে?

হাত তুলে নিজের নিজের দলকে থামাতে থামাতে দুদিক থেকে দুজনে এল ছুটে।

ততক্ষণে বাড়িতেও সাড়া উঠেছে—ওরে এষা যে! এষা!!... কী বিঁধল গায়ে?... কী সর্বনাশ হলো!... এষাই যে আমাদের! বেরুল কোন্ দিক দিয়ে?

বেরিয়ে এল সবাই বাড়ি থেকে। বন্দুকের দরকার নেই, তবুও হাতেই থেকে গেছে; মাথাটা নীচু—হিন্দু-মুসলমানের একই ভগবান খোদাতালার চরণে নতি জানিয়েই কি?

ফিরে এসে টেলিফোনে খবর পাওয়া গেল, দিল্লি থেকে গান্ধিজি আসছেন, হাজিসায়েবের তলব হয়েছে, আবার সবাই হাতে হাত দিয়ে করতে হবে চেষ্টা। সব ভাই মিলে সব ভাইকে হবে বাঁচাতে।

ভাঙার গান

কাজী নজরুল ইসলাম

কারার ওই লৌহ-কপাট
ভেঙে ফেল, কররে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল-পুজোর পাষাণ-বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ
ধ্বংস-নিশান,
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি।
গাজনের বাজনা বাজা!
কে মালিক? কে সে রাজা?
কে দেয় সাজা
মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে?
হা হা হা পায় যে হাসি,
ভগবান পরবে ফাঁসি?
সর্বনাশী
শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?

ওরে ও পাগলা ভোলা
দে রে দে প্রলয়-দোলা
গারদগুলা
জোরসে-ধরে হেঁচকা টানে!
মার হাঁক হৈদরী হাঁক,
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক,
ডাক ওরে ডাক
মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে!
নাচে ওই কাল-বোশেখি,
কাটাবি কাল বসে কি?
দেরে দেখি
ভীম কারার ওই ভিত্তি নাড়ি!
লাথি মার, ভাঙরে তালা!
যত সব বন্দি-শালায়—
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি!

চিঠি

স্বামী বিবেকানন্দ

আলমোড়া, ২৯ জুলাই, ১৮৯৭

কল্যাণীয়া মিস নোব্‌ল্[১],

স্টার্ডি[২]-র একখানি চিঠি কাল পেয়েছি। তাতে জানলাম যে, তুমি ভারতে আসতে এবং সবকিছু চাক্ষুষ দেখতে দৃঢ়সংকল্প। কাল তার উত্তর দিয়েছি। কিন্তু মিস মুলারের[৩] কাছ থেকে তোমার কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে যা জানতে পারলাম, তাতে এ পত্রখানিও আবশ্যক হয়ে পড়েছে; মনে হচ্ছে, সরাসরি তোমাকে লেখা ভালো।

তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত

সিংহীর প্রয়োজন। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালোবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনিতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।

কিন্তু বিঘ্নও আছে বহু। এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কী ধরনের, তা তুমি ধারণা করতে পারো না। এদেশে এলে তুমি নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা; ভয়েই হোক বা ঘৃণাতেই হোক—তারা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে এবং তারাও এদের খুব ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে, শ্বেতাঙ্গেরা তোমাকে খামখেয়ালি মনে করবে এবং প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চক্ষে দেখবে।

তা ছাড়া, জলবায়ু অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান। এদেশের প্রায় সব জায়গার শীতই তোমাদের গ্রীষ্মের মতো; আর দক্ষিণাঞ্চলে তো সর্বদাই আগুনের হলকা চলছে।

শহরের বাইরে কোথাও ইউরোপীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুমাত্র পাবার উপায় নেই। এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর, তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত জানাচ্ছি। সর্বত্র যেমন, এখানেও তেমনি আমি কেউ নই; তবু আমার যেটুকু প্রভাব আছে, সেটুকু দিয়ে আমি অবশ্যই তোমায় সাহায্য করব।

কর্মে ঝাঁপ দেবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা করো এবং কাজের পরে যদি বিফল হও কিংবা কখনও কর্মে বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে—তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্ত-ধর্ম ত্যাগই কর আর ধরেই থাকো। 'মরদ কি বাত হাতি কা দাঁত'—একবার বেরুলে আর ভিতরে যায় না; খাঁটি লোকের কথারও তেমনি নড়চড় নেই—এই আমার প্রতিজ্ঞা। আবার তোমাকে একটু সাবধান করা দরকার—তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, মিস মুলার কিংবা অন্য কারও পক্ষপুটে আশ্রয় নিলে চলবে না। তাঁর নিজের ভাবে মিস মুলার চমৎকার মহিলা; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই ধারণা ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মাথায় ঢুকেছে যে, তিনি আজন্ম নেত্রী আর দুনিয়াকে ওলটপালট করে দিতে টাকা ছাড়া অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। এই মনোভাব তাঁর অজ্ঞাতসারেই বারবার মাথা তুলছে এবং দিন কয়েকের মধ্যেই তুমি বুঝতে পারবে যে, তাঁর সঙ্গে বনিয়ে চলা অসম্ভব। তাঁর বর্তমান সংকল্প এই যে, তিনি কলকাতায় একটি বাড়ি ভাড়া নেবেন—তোমার ও নিজের জন্য এবং ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে যেসব বন্ধুদের আসার সম্ভাবনা আছে তাঁদেরও জন্য। এটা অবশ্য তাঁর সহৃদয়তা ও অমায়িকতার পরিচায়ক; কিন্তু তাঁর মঠাধ্যক্ষাসুলভ সংকল্পটি দুটি কারণে কখনও সফল হবে না—তাঁর রুক্ষ মেজাজ এবং অদ্ভুত অস্থিরচিত্ততা। কারও কারও সঙ্গে দূর থেকে বন্ধুত্ব করাই ভালো; যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তার সবই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

মিসেস সেভিয়ার[৪] নারীকুলের রত্নবিশেষ; এত ভালো, এত স্নেহময়ী তিনি। সেভিয়ার-দম্পতিই[৫] একমাত্র ইংরেজ, যাঁরা এদেশীয়দের ঘৃণা করেন না; এমনকি স্টার্ডিকেও বাদ দেওয়া চলে না। একমাত্র সেভিয়াররাই আমাদের উপর মুরুব্বিয়ানা করতে এদেশে আসেননি। কিন্তু তাঁদের এখনও কোনো নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী নেই। তুমি এলে তোমার সহকর্মিরূপে তাঁদের পেতে পারো এবং তাতে তোমার ও তাঁদের—উভয়েরই সুবিধা হবে। কিন্তু আসল কথা এই যে, নিজের পায়ে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে।

আমেরিকার সংবাদে জানলাম যে, আমার দুজন বন্ধু—মিস ম্যাকলাউড[৬] ও বস্টনের মিসেস বুল[৭] এই শরৎকালেই ভারত পরিভ্রমণে আসছেন। মিস ম্যাকলাউডকে তুমি লন্ডনেই দেখেছ—সেই পারি-ফ্যাশনের

পোশাক-পরিহিতা মহিলাটি! মিসেস বুলের বয়স প্রায় পঞ্চাশ এবং তিনি আমেরিকায় আমার বিশেষ উপকারী বন্ধু ছিলেন। তাঁরা ইউরোপ হয়ে এদেশে আসছেন, সুতরাং আমার পরামর্শ এই যে, তাঁদের সঙ্গে এলে তোমার পথের একঘেয়েমি দূর হতে পারে।

মি. স্টার্ডির কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত একখানা চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছি। কিন্তু চিঠিটি বড়ো শুষ্ক এবং প্রাণহীন। লন্ডনের কাজ পণ্ড হওয়ায় তিনি হতাশ হয়েছেন বলে মনে হয়।

অনন্ত ভালোবাসা জানবে। ইতি সদা ভগবৎ-পদাশ্রিত, বিবেকানন্দ

(সম্পাদিত)

উল্লেখপঞ্জি

১. মিস নোব্‌ল্ : সম্পূর্ণ নাম মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল্। স্বামীজির শিষ্যাদের মধ্যে অন্যতমা এবং অগ্রগণ্যা। স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় এদেশে আসেন এবং ভারতের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। (পাঠ্য চিঠিতে সেই প্রেক্ষাপটটিই উল্লিখিত হয়েছে।) ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাজে এবং স্বাধীনতার আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ভারতীয় আদর্শে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনের জন্য কলকাতার বাগবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যা আজকে 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' নামে খ্যাত। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলি হলো — 'The Master as I saw him', 'Web of Indian Life' প্রভৃতি। তিনি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে দার্জিলিং-এ দেহত্যাগ করেন।

২. স্টার্ডি : মিঃ ই টি স্টার্ডি। স্বামী বিবেকানন্দের একজন ইংরেজ ভক্ত। প্রথম জীবনে যখন ভারতে ছিলেন তখন আলমোড়ায় তপস্যা করেন। ইংল্যান্ডে বেদান্ত প্রচারের কাজে তিনি স্বামীজিকে সাহায্য করেন।

৩. মিস মুলার : সম্পূর্ণ নাম মিস হেনরিয়েটা মুলার। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজি কিছুদিন তাঁর অতিথি ছিলেন। বেলুড় মঠ স্থাপনের কাজে তিনি অর্থসাহায্য করেছিলেন।

৪. মিসেস সেভিয়ার : ক্যাপ্টেন জে এইচ সেভিয়ারের স্ত্রী। স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত ইংরেজ শিষ্যা। বেদান্ত প্রচারের কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। স্বামীজির ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণায় 'মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু বছর মায়াবতী এবং শ্যামলাতালে বাস করেন। রামকৃষ্ণ সংঘে 'মাদার' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে মিসেস সেভিয়ারের মৃত্যু হয়।

৫. সেভিয়ার দম্পতি : ক্যাপ্টেন জে. এইচ. সেভিয়ার এবং তাঁর স্ত্রী মিসেস সেভিয়ারের কথা বলা হয়েছে। মিসেস সেভিয়ারের প্রসঙ্গে আমরা আগেই জেনেছি। স্বামীজির ইচ্ছায় বেদান্ত প্রচারের উদ্দেশ্যে সেভিয়ার দম্পতি 'মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে মায়াবতীতে ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের মৃত্যু হয়।

৬. মিস ম্যাকলাউড : সম্পূর্ণ নাম মিস জোসেফাইন ম্যাকলাউড। স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য দেশীয় প্রধান অনুরাগী ভক্তদের মধ্যে অন্যতমা। তিনি সবসময় স্বামীজিকে তাঁর কাজে সাহায্য করতেন। তাঁর জীবন স্বামীজির চিন্তা-ভাবনা ও কাজের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। স্বামীজি তাঁকে 'জো' বলে ডাকতেন। তিনি বহুবার বেলুড় মঠে এসেছেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার হলিউড শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

৭. মিসেস বুল : সম্পূর্ণ নাম সারা (Sarah) বুল। নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালা বাদক মিঃ ওলি বুলের স্ত্রী। স্বামীজির শিষ্যা। অনেক চিঠিতে স্বামীজি তাঁকে 'মা' বা 'ধীরামাতা' বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি বেলুড় মঠ স্থাপনের কাজে স্বামীজিকে অনেক অর্থসাহায্য করেছিলেন। এছাড়া অন্যান্যভাবেও তিনি এদেশে ও পাশ্চাত্যে স্বামীজিকে সাহায্য করেছিলেন।

আমরা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালি বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে;—
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনক ধান্য, বুক-ভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,—
আমরা বাঙালি বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশানন জয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।
একহাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর-হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লিনাথে।

জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান্ কপিল সাঙ্খ্যকার
এই বাংলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।
বাঙালি অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালি দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙালির ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরের' ভিত্তি,
শ্যাম-কম্বোজে 'ওঙ্কার-ধাম',—মোদেরি প্রাচীন কীর্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিট্পাল আর ধীমান–যাদের নাম অবিনশ্বর।
আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় করে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে অমৃতের টিকা পরি'।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙালির ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

তপের প্রভাবে বাঙালি সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালি দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙালির কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালি জনম বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালি ধাতার আশীর্বাদে।

বেতালের মুখে প্রশ্ন যে ছিল আমরা নিয়েছি কেড়ে,
জবাব দিয়েছি জগতের আগে ভাবনা ও ভয় ছেড়ে;
বাঁচিয়া গিয়েছি সত্যের লাগি' সর্ব করিয়া পণ,
সত্যে প্রণমি থেমেছে মনের অকারণ স্পন্দন।
সাধনা ফলেছে, প্রাণ পাওয়া গেছে জগৎ-প্রাণের হাটে,
সাগরের হাওয়া নিয়ে নিশ্বাসে গম্ভীরা নিশি কাটে;
শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি।

মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে,—
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে;
অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালির গৌরবে।
প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশি,
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষি;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

ষষ্ঠ পাঠ

নিরুদ্দেশ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দিনটা ভারী বিশ্রী। শীতের দিনে বাদলার মতো এত অস্বস্তিকর আর কিছু বোধহয় নাই। বৃষ্টি ঠিক যে পড়িতেছে তাহা নয়। কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও ম্লান পৃথিবী কেমন মৃতের মতো অসাড় হইয়া আছে। সোমেশ হঠাৎ আজ আসিয়া না পড়িলে কেমন করিয়া দুপুরটা কাটাইতাম বলিতে পারি না। কিন্তু সোমেশও আজ যেন কেমন হইয়া আসিয়াছে।

খবরের কাগজটা দু-একবার উলটাইয়া পালটাইয়া সোমেশের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম—‘একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছ?’

‘কী?’

‘আজকের কাগজে একসঙ্গে সাত-সাতটা নিরুদ্দেশ-এর বিজ্ঞাপন।’

সোমেশ কোনো কৌতূহলই প্রকাশ করিল না। যেমন বসিয়াছিল, তেমনি উদাসীন ভাবেই শুধু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল। নিস্তব্ধ ঘরের ভিতর ধোঁয়ার কুণ্ডলী শুধু ধীরে ধীরে পাক খাইতে খাইতে ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। আর সমস্তই নিশ্চল স্তব্ধ। বাইরের অসাড়তা যেন আমাদের মনের উপরও চাপিয়া ধরিয়াছে।

নেহাৎ একটা কিছু করিয়া এই অস্বস্তিকর স্তব্ধতা ভাঙিবার প্রয়োজনেই আরম্ভ করিলাম, —'নিরুদ্দেশ'-এর এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখলে কিন্তু আমার হাসি পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা কী হয় জান তো? ছেলে হয়তো রাত করে থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরেছেন। এমন তিনি প্রায়ই ফিরে থাকেন আজকাল। খেতে বসবার সময় বাবা কয়েকদিন খোঁজ করেছেন—'কোথায় গেলেন বাবু! তোমার গুণধর পুত্রটি!'

লুকোনো পুঁজি থেকে মা বিকেলে ছেলের পেড়াপিড়িতে টাকা কটা বার করে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি জেনে শুনে মিথ্যে আর বলতে পারেন না— চুপ করে থাকেন।

বাবা বলে যান,—'এত রাত্রেও বাবুর আসবার সময় হলো না। আরবারে তো ফেল করে মাথা কিনেছেন। এবারও কী করে কৃতার্থ করবেন বুঝতেই পারছি। পয়সাগুলো আমার খোলামকুচি কিনা, তাই নবাবপুত্তুর যা খুশি তাই করছেন। দূর করে দেবো, এবার দূর করে দেবো।'

এই মৌখিক আস্ফালনেই হয়তো ব্যাপারটা শেষ হতে পারত। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে গুণধর পুত্রের প্রবেশ।

বাবা ঝোঁকটা আর কাটিয়ে উঠতে পারেন না। নিজের কাছে মান রাখবার জন্যেও কিছু বলতে হয়।

কতটা রাগ দেখানো উচিত ঠিক করতে না পেরে বলার মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত বাবা বলেন, 'এমন ছেলের আমার দরকার নেই—বেরিয়ে যা।'

অভিমানী ছেলে আর কিছু না হোক, পিতৃদেবের এ আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করতে উদ্যত হয়।

মা কোন দিক সামলাবেন বুঝতে না পেরে কাতরভাবে শুধু বলেন, —'আহা খাওয়া-দাওয়ার সময় কেন এসব বলো তো! পরে বললেই তো হতো।'

বাবা এবার মা-র ওপর মারমুখী হয়ে ওঠেন—'তোমার আশ্কারাতেই তো উচ্ছন্নে গেছে! মাথাটি তো তুমিই খেয়েছ আদর দিয়ে।'

মা আঁচলে চোখ মোছেন। ছেলে বিশাল পৃথিবীতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে।

পরের দিন ভয়ানক কাণ্ড। মা সেই রাত থেকে দাঁতে কুটি কাটেননি! আজকের দিনও বিছানা থেকে উঠবেন মনে হয় না। বাবারও হয়তো রাত্রে ঘুম হয়নি। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করবেন কোন মুখে!

গৃহিণীকে ধমক দিয়ে বলেন—'মিছিমিছি প্যানপ্যান কোরো না। অমন ছেলে যাওয়াই ভালো।'

মা-র কান্না আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

বাবা এবার দাঁত খিচিয়ে বললেও নিজের মনের আশার কথাটাই বোধহয় জানান—'তাও গেলে তো বাঁচতাম। এ বেলাই দেখো সুড়সুড় করে আবার ফিরে আসবে। এমন বিনি পয়সার হোটেলখানা পাবে কোথায়?'

মা এবার অশ্রুসিক্ত স্বরে বলেন—'এই দারুণ শীতে কাল সারারাত কোথায় রইল কে জানে! কী করে বসে আমার তাই ভয়।'

'হ্যাঁ ভয়!'—বাবা কথাটাকে ব্যঙ্গ করেই উড়িয়ে দিতে চান 'তোমার ছেলে কিছু করেনি গো কিছু করেনি। দিব্যি আছে কোনো বন্ধুর বাড়ি। অসুবিধে হলেই এসে দেখা দেবে।'

মা-র কান্না তবু থামে না।—'কীরকম অভিমানী জানো তো।'

বিরক্ত হতে বাবা বেরিয়ে যান। সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে ফিরে এসে দেখেন অবস্থা গুরুতর। ছেলে ফেরেনি। মা শয্যা থেকে আর উঠবেন না বলেই পণ করেছেন।

'না আর থাকতে দিলে না! এ অশান্তির চেয়ে বনবাস ভালো।' বলে বাবা বেরিয়ে পড়েন এবং ওঠেন গিয়ে একেবারে খবরের কাগজের অফিসে।

খবরের কাগজের অফিসের ব্যাপারটা বড়ো জটিল। কোন দিকে কী করতে হয় কিছু বোঝা যায় না। খানিক এদিক-ওদিক বিমূঢ়ভাবে ঘুরে এক দিকের একটা অফিসঘরে ঢুকে পড়ে নিরীহ চেহারার এক ভদ্রলোককে বেছে নিয়ে সাহস করে জিজ্ঞাসা করেন—'আপনাদের কাগজে এই—এই একটা খবর বার করতে চাই!'

নিরীহ চেহারার লোকটি হঠাৎ মুখ তুলে ব্যঙ্গের স্বরে বলেন—'খবর! কেন আমাদের খবরগুলো পছন্দ হচ্ছে না! আমরা কি এতদিন রামযাত্রা বার করেছি!'

বাবা একটু হতভম্ব হয়ে একবার অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকান। পাশের যে ভদ্রলোকটির মুখ দেখে অত্যন্ত রূঢ় প্রকৃতির মনে হয়েছিল, তিনিই সহানুভূতির স্বরে বলেন, 'আহা কী করছ! ভদ্রলোক কী বলতে চান, শোনোই না! বসুন আপনি।'

বাবা একটা চেয়ারে একটু অপ্রস্তুতভাবে বসবার পর তিনি বলেন—'কী খবর বলছিলেন!'

'আজ্ঞে ঠিক খবর নয় এই—এই একটু বিজ্ঞাপন!'

'বিজ্ঞাপন? কীসের বিজ্ঞাপন? কতটা স্পেস দরকার? কপি এনেছেন?'

বাবা আরো বিমূঢ়ভাবে বলেন—'আজ্ঞে ঠিক বিজ্ঞাপন নয়—এই আমার ছেলে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে—'

তাঁকে আর কথা শেষ করতে হয় না। টেবিলের অপর দিক থেকে ভদ্রলোক বলেন—'ও বুঝেছি, নিরুদ্দেশ! কী দেবেন—চেহারার বর্ণনা, না ফিরে আসবার অনুরোধ!'

বাবা যেন এতক্ষণে কূল পেয়ে বলেন—'আজ্ঞে হ্যাঁ, ফিরে আসবার অনুরোধ! ওর মা বড়ো কাঁদাকাটি করছে।'

'বুঝেছি বুঝেছি। রাগারাগি করে গিয়েছে বুঝি?' ভদ্রলোক একটা কাগজের প্যাড বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন—'নিন, লিখে দিন!'

'লিখে!' বাবার মুখের বিপদগ্রস্তভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।

ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে বলেন—'আচ্ছা আমরা লিখে দেবো'খন। আপনি শুধু নামটামগুলো দিয়ে যান।'

পরিচয় ইত্যাদি দিয়ে যাবার সময় বাবা অনুরোধ করেন, ‘একটু ভালো করে লিখে দেবেন। ওর মা কাল থেকে জলগ্রহণ করেনি।’

‘সে বলতে হবে না, এমন লিখে দেবো, যে পড়ে আপনার ছেলে কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।’

আশ্বস্ত হয়ে বাবা ঘরে ফেরেন। কিন্তু অশ্রুসজল বিজ্ঞাপন বার হবার আগেই দেখেন ছেলে ঘরে এসে হাজির।

অনুতপ্ত হয়ে সে এসেছে মনে কোরো না; সে বাড়িতে থাকতে আসেনি! শুধু একবার চলে যাবার আগে তার গোটাকতক বই নিয়ে যেতে এসেছে।

এবার মা-র ক্রুদ্ধস্বর শোনা যায়, ‘তা যাবি বই কি; অমনি কুলাঙ্গার তুই তো হয়েছিস। কোনো ছেলে যেন আর বকুনি খায় না। তুই একেবারে পির হয়েছিস? কাল সারারাত দুচোখের পাতা এক করেননি তা জানিস? ভেবে ভেবে চেহারাটা আজ কী হয়েছে দেখে আয়! উনি তেজ করে চলে যাবেন!’

বাবা এবার ভেতরে ঢুকে মৃদুস্বরে বলেন—‘আঃ আর বকাবকি কেন?’

মা ধমক দিয়ে বলেন—‘তুমি থামো। অত আদর ভালো নয়! একটু বকুনি খেয়েছেন বলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এত বড়ো আস্পর্ধা!’

অধিকাংশ নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনের ইতিহাসই এই।

সোমেশের সিগারেটটা তখন শেষ হইয়াছে। এতক্ষণ ধরিয়া আমার কথা সে মোটেই শুনিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। একবার একটু নড়িয়া বসিতেও তাহাকে দেখা যায় নাই।

একটু বিরক্ত স্বরেই বলিলাম,‘কী হয়েছে তোমার বলো তো? মিছিমিছিই আমি একলা বকে মরছি।’

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া সোমেশ হঠাৎ ছড়ানো পা গুটাইয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিয়া সিগারেটের অবশিষ্টটুকু ফেলিয়া দিল। তারপর বলিল,—

‘তুমি জানো না। এই বিজ্ঞাপনের পেছনে অনেক সত্যকার ট্র্যাজিডি থাকে।’

‘তা থাকে যে আমি অস্বীকার করছি না। কখনো-কখনো সত্যিই যে যায় সে আর ফেরে না।’

সোমেশ একটু হাসিয়া বলিল, ‘না, তা বলছি না। ফিরে আসারই ভয়ানক একটা ট্র্যাজিডির কথা আমি জানি।’

আমি উৎসুকভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম,‘তার মানে?’

‘শোনো বলছি।’

বাহিরে এতক্ষণে বৃষ্টি আবার আরম্ভ হইয়াছে। কাঁচের শার্সির ভিতর দিয়া বাহিরের রাস্তাঘাট ঝাপসা অবাস্তব দেখাইতেছে। মনে হইতেছে আমরা যেন সমস্ত পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি।

'পুরানো খবরের কাগজের ফাইল যদি উলটে দেখো, তাহলে দেখতে পাবে বহু বছর আগে এখানকার একটি প্রধান সংবাদপত্রের পাতায় দিনের পর দিন একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। সে বিজ্ঞাপন নয়, সম্পূর্ণ একটি ইতিহাস। দিনের পর দিন ধারাবাহিকভাবে পড়ে গেলে সম্পূর্ণ একটি কাহিনি যেন জানা যায়। মনে হয় ছাপার লেখায় সত্যি যেন কান পাতলে কাতর আর্তনাদ শোনা যাবে। সে বিজ্ঞাপন অবশ্য 'নিরুদ্দেশে'র। প্রথমে দেখা যায় মায়ের কাতর অনুরোধ ছেলের প্রতি ফিরে আসবার জন্য। অস্পষ্ট আড়ষ্ট ভাষা, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে কী ব্যাকুলতা যে প্রকাশ পেয়েছে তা না পড়লে বোঝা যায় না। ধীরে ধীরে মায়ের কাতর অনুরোধ হতাশ দীর্ঘশ্বাসের মতো খবরের কাগজের পাতায় যেন মিলিয়ে যেতেও দেখা গেল। তারপর শোনা গেল পিতার গম্ভীর স্বর, একটু যেন কম্পিত তবু ধীর ও শান্ত–'শোভন ফিরে এসো। তোমার মা শয্যাগত। তোমার কি এতটুকু কর্তব্যবোধও নেই!'

বিজ্ঞাপন তারপরেও কিন্তু থামল না। পিতার স্বর ভারী হয়ে আসছে যেন; মনে হয় যেন গলাটা ধরা। 'শোভন, এখন না এলে তোমার মাকে আর দেখতে পাবে না।'

কিন্তু শোভনের হৃদয় এতে বুঝি গলল না। দেখা গেল বিজ্ঞাপন সমানভাবে চলেছে, শুধু পিতার নিজেকে সামলাবার আর ক্ষমতা নাই। এবার তাঁর স্বরে কাতরতা–শুধু কাতরতা নয়, একান্ত দুর্বলতা–'শোভন, জানো না আমাদের কেমন করে দিন যাচ্ছে! এসো, আর আমাদের দুঃখ দিও না।'

বিজ্ঞাপন ক্রমশ হতাশ হাহাকার হয়ে উঠল। তারপর একেবারে গেল বদলে। আর শোভনকে উদ্দেশ করে কিছু লেখা নাই। সাধারণ একটি বিজ্ঞপ্তি মাত্র। এই ধরনের এই চেহারার এই বয়সের একটি ছেলে। আজ এক বৎসর তার কোনো সন্ধান নেই। সন্ধান দিতে পারলে পুরস্কার পাওয়া যাবে।

পুরস্কারের পরিমাণ ক্রমশই বাড়তে লাগল খবরের কাগজের পাতায়। দোহারা ছিপছিপে একটি বছর ষোলো-সতেরোর ছেলে। পরিচয়-চিহ্ন ঘাড়ের দিকে ডান কানের কাছে একটি বড়ো জড়ুল। জীবিত না মৃত এইটুকু যদি কেউ সন্ধান দিতে পারে, তাহলেও পুরস্কার পাওয়া যাবে।

সোমেশ চুপ করিল খানিকক্ষণের জন্য। জলের ছাটে শার্সির কাঁচ একেবারে ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর ঠান্ডায় মনে হইতেছে একটা কম্বল-টম্বল জড়াইতে পারিলে ভালো হয়।

বলিলাম–'এত গেল বিজ্ঞাপনের উপাখ্যান। আসল ব্যাপারের কিছু জানো নাকি?'

'জানি! শোভনকে আমি জানতাম। সে যে কোনো ভয়ংকর অভিমানের বশে বাড়ি ছেড়ে এসেছিল তা মনে কোরো না। বাড়ি ছাড়াটাই তার কাছে একান্ত সহজ। ছুতোটা যা হোক কিছু হলেই হলো। পৃথিবীতে দু-একটা লোক আসে জন্ম থেকেই একেবারে নির্লিপ্ত মন নিয়ে। তারা ঠিক কঠিনহৃদয় নয়। বরং বলা যেতে পারে তাদের মন তৈলাক্ত। পিচ্ছিল বলে তারা কোথাও ধরা পড়ে না, কিছুই তাদের মনে দাগ দিতে পারে না। শুনলে আশ্চর্য হবে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের সংবাদ জানলেও সেগুলো সে অনুসরণই করেনি। কোনোদিন চোখে পড়েছিল হয়তো–তারপর অনায়াসে সেগুলো গেছল ভুলে। বাড়ির বাইরে যে সমস্ত দুঃখ অসুবিধায় অন্য কেউ হলে হয়রান হয়ে পড়ত তার ভেতরেই সে পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। অন্য কেউ যাই ভাবুক সে নিজেকে একটি ছোটো সংসারের আদরের ছেলে হিসেবে শুধু ভাবতে পারেনি। কিন্তু বিজ্ঞাপন যেদিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, সেদিন কেন বলা যায় না তার উদাসীন মনও বিচলিত হয়ে উঠল। বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়েছিল একটু

অসাধারণভাবে! ক্লান্তভাবে চলতে চলতে একদিন হঠাৎ তা থেমে যায়নি, হঠাৎ যেন একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনায় সংবাদপত্রের পাতা স্তব্ধ হয়ে গেল। শোভনের চেহারার বর্ণনার বদলে হঠাৎ একদিন দেখা গেল,–

'শোভন, তোমার মার সঙ্গে আর তোমার বুঝি দেখা হলো না। তিনি শুধু তোমারই নাম করছেন এখনো।' তারপর আর কোনো বিজ্ঞাপন দেখা গেল না।

প্রায় দুই বৎসর তখন কেটে গেছে। শোভন একদিন হঠাৎ গিয়ে হাজির তার দেশে। একটা ব্যাপারে শোভনের প্রকৃতির খানিকটা পরিচয় পাবে। সে কথাটা আগে বলিনি। শোভন সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে নয়। সম্পন্ন বললেও তাদের ঠিক বর্ণনা করা হয় না। তাদের প্রাচীন জমিদারি অনেক দুর্দিনের ভেতর দিয়ে এসেও তখনও তেমন ক্ষয় পায়নি। শোভনই তার একমাত্র উত্তরাধিকারী।'

সোমেশ একটু থামতেই আমি বললাম, 'যাক শেষটুকু আর না বললেও চলবে। বুঝতে পেরেছি।'

সোমেশ একটু হাসিয়া কোনো উত্তর না দিয়া বলিয়া চলিল–'দু-বছর স্বাধীন জীবনের দুঃখ-কষ্ট গায়ে না মাখলেও তার ছাপ শোভনের ওপর তখন পড়েছে। দু-বছরে সে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তাদের কর্মচারীরা তাকে চিনতে পারবে না এতটা আশঙ্কা করেনি।'

শোভন দেশে পৌঁছে সোজাসুজি তাদের বাড়ি ঢুকছিল, প্রথমে তাকে বাধা দিলেন তাদের পুরানো নায়েবমশাই।

'কাকে চান?'

শোভন হেসে বললে–'কাউকে না, বাড়িতে যেতে চাই।'

নায়েবমশাই তার দিকে খানিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর একটু স্মিতহাস্যে বললেন–'ওঃ কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন, আসুন, বারবাড়িতে একটু বিশ্রাম করুন।'

শোভন অবাক হয়ে বললে–'সে কি? কী হয়েছে নায়েবমশাই?'

'না, না, হয়নি কিছু!'

'মা ভালো আছেন?' শোভনের প্রশ্নে এবার সত্যি ব্যাকুলতা ছিল।

নায়েবমশাই তেমনি অদ্ভুত হাসি হেসে বললেন–'ভালো আছেন বইকি! আসুন! আসুন আমার সঙ্গে।'

শোভন তবু বললে–'কিন্তু ভেতরে গেলেই তো হয়।'

নায়েবমশাই একটু যেন কঠিন স্বরে বললেন–'না হয় না, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

শোভন রীতিমতো বিমূঢ় অবস্থায় আবার নায়েবমশাইকে অনুসরণ করে বারবাড়িতে গিয়ে উঠল। দু-বছরে সেখানে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। পুরানো সরকার তাদের নেই। নতুন দুটি লোক সেখানে বসে খাতা লিখছে! তার পরিচিত বৃদ্ধ খাজাঞ্চিমশাইকে দেখে সে যেন আশ্বস্ত হলো।

নায়েবমশাই তাকে একটা চেয়ারে বসতে বলে খাজাঞ্চিমশাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন–'ইনি ভেতরে যেতে চাইছেন!'

শোভনের কাছে নায়েবমশাই-এর গলার স্বর কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হলো। খাজাঞ্চিমশাই নাকের ওপরকার চশমাটা একটু আঙুল দিয়ে তুলে তার দিকে চেয়ে বললেন–'ওঃ ইনি আজই এসেছেন বুঝি!'

'হ্যাঁ, এইমাত্র।'

শোভন এবার অধীরভাবে বলে উঠল, 'আপনারা কী বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন! মার কি কিছু হয়েছে? বাবা কেমন আছেন?'

চারিধারের সব কটা দৃষ্টি তার ওপর অদ্ভুতভাবে নিবদ্ধ। খানিকক্ষণ সকলেই নীরব। তারপর নায়েবমশাই বললেন, –'তাঁরা সবাই ভালো আছেন। কিন্তু এখন তো আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।'

এবার শোভন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল–'কেন দেখা হবে না? আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে! আমি চললুম।'

শোভন উঠল। কিন্তু নায়েবমশাই দরজার কাছে সামান্য কিছু এগিয়ে গিয়ে শান্তভাবে বললেন–'দেখুন, মিছিমিছি কেলেংকারি করে লাভ নেই! তাতে ফল হবে না কিছু।'

হঠাৎ শোভনের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ভয়ংকরভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে বিস্মিত ভীত কণ্ঠে বলল–'আপনারা কি আমাকে চিনতে পারছেন না?'

সকলে নীরব।

'আমি শোভন,–বুঝতে পারছেন না আমি শোভন?'

নায়েবমশাই এবার বললেন–'আপনি একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।' পাশের ঘরে গিয়ে টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে তিনি একটা জিনিস এনে শোভনের হাতে দিলেন। তারই একটা পুরানো ফটো, সাধারণভাবে তোলা। এখন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে একটু।

নায়েবমশাই বললেন,–'চেনেন একে?'

শোভন বিস্মিত কণ্ঠে বললে,–'এ তো আমারই ফটো। দেখুন ভালো করে আপনারাই মিলিয়ে। নাঃ, এ অসহ্য।'

চুলগুলো মুঠি করে ধরে সে বসে পড়ল।

নায়েবমশাই তার সঙ্গে বসে বললেন–'দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে একটু মিল আছে সত্যি। কিন্তু এর আগে আরো দুজনের সঙ্গে ছিল। মায় জড়ুল পর্যন্ত। আমাদের এ নিয়ে গোলমাল করতে মানা আছে। আমরা কিছু হাঙ্গামা করব না। আপনি এখন চলে যেতে পারেন।'

শোভন উদ্‌ভ্রান্তভাবে সকলের দিকে চেয়ে দেখল। সকলের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস।

কাতরভাবে বলল, –'একবার শুধু আমি মা-বাবার সঙ্গে দেখা করব। আপনারা বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু একবার আমায় শুধু দেখা করতে দিন।'

নায়েবমশাই হতাশভাবে হাতের ভঙ্গি করে বললেন–'শুনুন তাহলে, সাতদিন আগে শোভন মারা গেছে। তার মৃত্যুর খবর আমরা পেয়েছি।'

শোভন এই অবস্থাতে না হেসে পারলে না, বললে–'কেমন করে মারা গেল?'

তার কণ্ঠস্বরের বিদ্রুপ উপেক্ষা করে নায়েবমশাই বললেন–'মারা গিয়েছে রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে অপঘাতে। নাম-ধাম পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু যারা দুর্ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল তাদের কয়েকজন খবরের কাগজে আমাদের বিজ্ঞাপন দেখে আমাদের সব কথা জানিয়েছেন। হাসপাতালেও আমরা খবর নিয়েছি। সেখানকার ডাক্তারের বর্ণনাও আমাদের সঙ্গে মিলে গিয়েছে।'

শোভন এরপর কী করত বলা যায় না, কিন্তু সেই সময় দেখা গেল তার বাবা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন। মানুষের সঙ্গে ঝড়ে ভাঙা গাছের যে এতদূর সাদৃশ্য হতে পারে, সাহিত্যের উপমা পড়েও কখনও তার মনে হয়নি। তাঁর চলার গতিতে পর্যন্ত যেন ভয়ংকর দুর্ঘটনার পরিচয় আছে।

সকলে কিছু বুঝে ওঠবার আগেই শোভন দৌড়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। নায়েব ও কর্মচারীরা ব্যাপারটা বুঝে যখন তার পিছু নিলে, তখন সে বাবার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

'বাবা!'

বৃদ্ধ থমকে দাঁড়ালেন। সে মুখের বেদনাময় বিমূঢ়তা শোভনের বুকে ছুরির মতো বিঁধল।

'বাবা আমায় চিনতে পারছ?'

বৃদ্ধ স্খলিতপদে এক পা এগিয়ে আবার থমকে গেলেন। প্রবল ভাবাবেগ তাঁর বার্ধক্যের শিথিল মুখকে বিকৃত করে দিচ্ছে।

তখন নায়েবমশাই ও কর্মচারীরা এসে পড়েছেন।

বৃদ্ধ কম্পিত হাত তুলে, কম্পিত স্বরে বললেন—'কে?'

নায়েবমশাই শোভনের কাঁধে দৃঢ় ভাবে হাত রেখে বললেন—'না, কেউ না। সেই সেবারের মতো—এই নিয়ে তিন বার হলো!'

একজন কর্মচারী বললে—'আমরা আসতে দিইনি, হঠাৎ আমাদের হাত ছাড়িয়ে—'

বৃদ্ধ তাকে থামিয়ে বললেন—'কিছু বোলো না, চলে যেতে দাও।' বৃদ্ধ শেষ বার শোভনের দিকে কাতরভাবে চেয়ে আবার ঘরের দিকে ফিরলেন।

শোভন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নায়েবমশাই তাকে কী বলছিলেন। অনেকক্ষণ সে কিছু শুনতে পায়নি। কখন সে আবার বারবাড়িতে এসে বসেছে, তাও তার মনে নেই।

আচ্ছন্নতা তার কাটল খানিক বাদে। ভেতর বাড়ি থেকে একজন কর্মচারী নায়েবমশাইকে এসে কী বলছে। নায়েবমশাই তাকে কী বলছেন ঠিক শোনা যাচ্ছে না। না, এইবার বোঝা যাচ্ছে। নায়েবমশাই-এর হাতে অনেকগুলো টাকার নোট। কণ্ঠস্বরে তাঁর মিনতি।

শোভনকে একটা কাজ করতে হবে। বাড়ির কর্ত্রী মুমূর্ষু, ছেলের মৃত্যুসংবাদ তিনি শোনেননি। তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। এখনও তিনি তাকে দেখবার আশা করে আছেন—সেই জন্যই বুঝি তিনি মৃত্যুতেও শান্তি পেতে পাচ্ছেন না। শোভনকে তাঁর হারানো ছেলে হয়ে একবার দেখা দিতে হবে। মুমূর্ষুর নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে কোনো কিছু ধরা পড়বে না। হারানো ছেলের সঙ্গে তার সত্যি সাদৃশ্য আছে। মৃত্যুপথযাত্রীকে এই শেষ সান্ত্বনাটুকু দেবার জন্যে জমিদার নিজে তাঁকে কাতর অনুরোধ জানিয়েছেন। তার এতে কোনো ক্ষতি নেই...

নায়েবমশাই নোটের তাড়াটা শোভনের হাতে গুঁজে দিলেন।

সোমেশ চুপ করিল। খানিকক্ষণ বাইরের বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নাই। আমি অবশেষে বলিলাম—'সোমেশ তোমার কানের কাছে একটা জড়ুল আছে।'

সোমেশ হাসিয়া বলিল,—'সেই জন্যেই গল্প বানানো সহজ হলো।'

কিন্তু কেন বলা যায় না—শীতের বাদলের এই শীতল প্রায়ান্ধকার অস্বাভাবিক অপরাহ্ণে তার হাসিটাই বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না।

ব্যথার বাঁশি

জসীমউদ্দীন

[পল্লিকবি জসীমউদ্দীনের লেখা নক্‌শীকাঁথার মাঠ অন্যতম জনপ্রিয় শোককাব্য। রূপাই ও সাজুর প্রণয় — বিরহের অসামান্য আখ্যান এই কাব্যে রচিত হয়েছে। 'ব্যথার বাঁশি 'কবিতাংশটি নক্‌শীকাঁথার মাঠ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। নামকরণ পর্ষদ প্রদত্ত।]

মাঠের রাখাল, বেদনা তাহার আমরা কি অত বুঝি;
মিছেই মোদের সুখ-দুখ দিয়ে তার সুখ-দুখ খুঁজি।
আমাদের ব্যথা কেতাবেতে লেখা, পড়িলেই বোঝা যায়;
যে লেখে বেদনা বে-বুঝ বাঁশিতে কেমনে দেখাব তায়?
অনন্তকাল যাদের বেদনা রহিয়াছে শুধু বুকে,
এ দেশের কবি রাখে নাই যাহা মুখের ভাষায় টুকে;
সে ব্যথাকে আমি কেমনে জানাব? তবুও মাটিতে কান;
পেতে রহি কভু শোনা যায় যদি কী কহে মাটির প্রাণ!
মোরা জানি খোঁজ বৃন্দাবনেতে ভগবান করে খেলা,
রাজা-বাদশার সুখ-দুখ দিয়ে গড়েছি কথার মেলা।
পল্লির কোলে নির্বাসিত এ ভাইবোনগুলো হায়,
যাহাদের কথা আধ বোঝা যায়, আধ নাহি বোঝা যায়;
তাহাদেরই এক বিরহিয়া বুকে কী ব্যথা দিতেছে দোল,
কী করিয়া আমি দেখাইব তাহা, কোথা পাব সেই বোল?
—সে বন-বিহগ কাঁদিতে জানে না, বেদনার ভাষা নাই,
ব্যাধের শায়ক বুকে বিঁধিয়াছে জানে তার বেদনাই।

বাজায় রূপাই বাঁশিটি বাজায় মনের মতন করে,
যে ব্যথা সে বুকে ধরিতে পারেনি সে ব্যথা বাঁশিতে ঝরে।

ছুটি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল, নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাঠ আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময় বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকলপ্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল, 'দেখ, মার খাবি! এইবেলা ওঠ।'

সে তাহাতে আরো একটু নড়িয়াচড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কষাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্তব্য ছিল—সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল, যেন ইচ্ছা করিলেই এখনই উহাকে রীতিমতো শাসন করিয়া দিতে পারে কিন্তু করিল না, কারণ পূর্বাপেক্ষা আর-একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর-একটু বেশি মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ওই কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিংবা আর-কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল—'মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।' গুঁড়ি একপাক ঘুরিতে-না-ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান-সমেত ভূমিস্যাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশি নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সি ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়।'

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল 'ওই হোথা।' কিন্তু কোনদিকে যে নির্দেশ করিল কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা।'

সে বলিল, 'জানিনে।' বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগদি আসিয়া কহিল, 'ফটিকদাদা, মা ডাকছে।'

ফটিল কহিল, 'যাব না।'

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, 'আবার তুই মাখনকে মেরেছিস!'

ফটিক কহিল, 'না, মারিনি।'

'ফের মিথ্যে কথা বলছিস!'

'কখখনো মারিনি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।'

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, 'হাঁ, মেরেছে।'

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, 'ফের মিথ্যে কথা!'

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চিৎকার করিয়া কহিলেন, 'অ্যাঁ, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস!'

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'কী হচ্ছে তোমাদের।'

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, 'ওমা, এ যে দাদা, তুমি কবে এলে।' বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভগিনী কহিলেন, 'ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।'

শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?'

ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'যাব।'

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল– কোনদিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয় কি মাথাই ফাটায় কি কী একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

'কবে যাবে', 'কখন যাবে' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্যবশত তাহার ছিপ ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমত মামির সঙ্গে আলাপ হইল। মামি এই অনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি

নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কীরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো-এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামির স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সবচেয়ে বাজিত। মামি যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো-একটা কাজ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত— অবশেষে মামি যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, 'ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাওগে। একটু পড়োগে যাও।'— তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামির এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই-সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা— কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলিসময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন— সেই

লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত। স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারক্লান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত, তখন জানলার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলোর ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর-রৌদ্রে কোনো-একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেমেয়ে কিছু-একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত, তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মামা, মার কাছে কবে যাব।' মামা বলিয়াছিলেন, 'স্কুলের ছুটি হোক।' কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনও ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামির কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, 'বই হারিয়ে ফেলেছি।'

মামি অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, 'বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারিনে।'

ফটিক আর-কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল– সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা শিরশির করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল ব্যামো বাধাইলে তাহার মামির প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামি এই ব্যামোটাকে যে কীরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে, তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভরবাবু পুলিশে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনও ঝুপঝুপ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিশের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভরবাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামি তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ। দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।'

বাস্তবিক, সমস্তদিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালোরূপ আহারাদি হয় নাই এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিটমিট করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, 'আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।'

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, 'মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি?'

বিশ্বম্ভরবাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড়বিড় করিয়া বকিতে লাগিল, বলিল, 'মা, আমাকে মারিসনে মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করিনি।'

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যালফ্যাল করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, 'ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।'

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন, অবস্থা বড়োই খারাপ।

বিশ্বম্ভরবাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতিমুহূর্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া বলিতে লাগিল, 'এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে—এ—এ না।' কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টিমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহুকষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে, তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "ফটিক! সোনা! মানিক আমার!"

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল, 'অ্যাঁ।'

মা আবার ডাকিলেন, 'ওরে ফটিক, বাপধন রে!'

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

জন্মভূমি আজ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একবার মাটির দিকে তাকাও
একবার মানুষের দিকে।

এখনও রাত শেষ হয়নি;
অন্ধকার এখনও তোমার বুকের ওপর
কঠিন পাথরের মতো, তুমি নিশ্বাস নিতে পারছ না।
মাথার ওপর একটা ভয়ংকর কালো আকাশ
এখনও বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে বসে আছে।
তুমি যেভাবে পারো এই পাথরটাকে সরিয়ে দাও
আর আকাশের ভয়ংকরকে শান্ত গলায় এই কথাটা জানিয়ে দাও—
তুমি ভয় পাওনি।

মাটি তো আগুনের মতো হবেই
যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো;
যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও
তোমার স্বদেশ তাহলে মরুভূমি।
যে মানুষ গান গাইতে জানে না
যখন প্রলয় আসে সে বোবা ও অন্ধ হয়ে যায়।
তুমি মাটির দিকে তাকাও, সে প্রতীক্ষা করছে;
তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু বলতে চায়।

রাধারাণী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্বে ভালো ছিল—বড়োমানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই; তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়; সর্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা; মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রিদার জ্ঞাতি ডিক্রি জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি; ডিক্রিদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা ছিল, তাহাও গেল; রাধারাণীর মাতা, অলংকারাদি বিক্রয় করিয়া, প্রিবি কৌন্সিলে একটি আপিল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটিরে

আশ্রয় লইয়া কোনো প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িতা হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না। মাতা রুগ্‌ণা, এ জন্য কাজে কাজেই তাহার উপবাস; রাধারাণীর জুটিল না বলিয়া উপবাস। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথ্যের প্রয়োজন হইল, কিন্তু পথ্য কোথা? কী দিবে?

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে, এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুই-একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্ধেক হইতে না হইতেই বড়ো বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোকসকল ভাঙিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে, আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড়ো অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার —পথ কর্দমময়, পিচ্ছিল—কিছুই দেখা যায় না। তাহাতে মুষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাণীর চক্ষু বারিবর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল—কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল। আবার কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ডবিলম্বী ঘন কৃষ্ণ অলকাবলি বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমতো সময় অন্ধকারে, অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কাঁদে নাই—এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল।

যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল, 'কে গা তুমি কাঁদ?'

পুরুষ মানুষের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল। রাধারাণীর চেনা লোক নহে কিন্তু বড়ো দয়ালু লোকের কথা—রাধারাণীর ক্ষুদ্র বুদ্ধিটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল, 'আমি দুঃখীলোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই—কেবল মা আছে।'

সে পুরুষ বলিল, 'তুমি কোথা গিয়াছিলে?'

রা। আমি রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ি যাইব। অন্ধকারে, বৃষ্টিতে পথ পাইতেছি না।

পুরুষ বলিল, 'তোমার বাড়ি কোথায়?'

রাধারাণী বলিল, 'শ্রীরামপুর।'

সে ব্যক্তি বলিল, 'আমার সঙ্গে আইস—আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চলো, কোন পাড়ায় তোমার বাড়ি—তাহা আমাকে বলিয়া দিয়ো—আমি তোমাকে বাড়ি রাখিয়া আসিতেছি। বড়ো পিছল, তুমি আমার হাত ধরো, নহিলে পড়িয়া যাইবে!'

এইরূপে সে ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু কথার স্বরে বুঝিয়াছিল যে, রাধারাণী বড়ো বালিকা। এখন রাধারাণী তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জানিল, রাধারাণী বড়ো বালিকা। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল যে, 'তোমার বয়স কত?'

রা। দশ-এগারো বছর—

‘তোমার নাম কী?’

রা। রাধারাণী।

‘হাঁ রাধারাণী! তুমি ছেলেমানুষ, একেলা রথ দেখিতে গিয়াছিলে কেন?’

তখন সে কথায় কথায়, মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি বলিয়া, সেই এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল যে, মাতার পথ্যের জন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া রথহাটে বেচিতে গিয়াছিল—রথ দেখিতে যায় নাই—সে মালাও বিক্রয় হয় নাই—এক্ষণেও বালিকার হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তখন সে বলিল, ‘আমি একছড়া মালা খুঁজিতেছিলাম। আমাদের বাড়িতে ঠাকুর আছেন, তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙিয়া গেল—আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচো তো আমি কিনি।’

রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্তু মনে ভাবিল যে, আমাকে যে এত যত্ন করিয়া হাত ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ি লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব কী প্রকারে? তা নহিলে, আমার মা খেতে পাবে না। তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারাণী, মালা সমভিব্যাহারীকে দিল। সমভিব্যাহারী বলিল, ‘ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও!’ সমভিব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল। রাধারাণী বলিল, ‘‘এ কি পয়সা? এ যে বড়ো বড়ো ঠেকচে।’’

‘ডবল পয়সা—দেখিতেছ না দুইটা বই দিই নাই।’

রা। তা এ যে অন্ধকারেও চকচক করচে। তুমি ভুলে টাকা দাও নাই তো?’

‘না। নূতন কলের পয়সা, তাই চকচক করচে।’

রা। তা, আচ্ছা, ঘরে গিয়ে প্রদীপ জ্বেলে যদি দেখি যে, পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে।

কিছু পরে তাহারা রাধারাণীর মার কুটিরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া, রাধারাণী বলিল, ‘তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও, আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি, টাকা কী পয়সা।’

সঙ্গী বলিল, ‘আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি। তুমি আগে ভিজা কাপড় ছাড়—তারপর প্রদীপ জ্বালিয়ো।’

রাধারাণী বলিল, ‘আমার আর কাপড় নাই—একখানি ছিল, তাহা কাচিয়া দিয়াছি। তা, আমি ভিজা কাপড়ে সর্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না। আঁচলটা নিঙড়ে পরিব এখন। তুমি দাঁড়াও, আমি আলো জ্বালি।’

‘আচ্ছা।’

ঘরে তৈল ছিল না, সুতরাং চালের খড় পাড়িয়া চকমকি ঠুকিয়া, আগুন জ্বালিতে হইল। আগুন জ্বালিতে কাজে কাজেই একটু বিলম্ব হইল। আলো জ্বালিয়া রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে।

তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া তল্লাশ করিয়া দেখিল যে, যে টাকা দিয়াছে, সে নাই—চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তখন বিষণ্ণবদনে সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিল—সকাতরে বলিল—‘মা! এখন কী হবে?’

মা বলিল, ‘কী হবে বাছা! সে কি আর না জেনে টাকা দিয়েছে? সে দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে—আমরাও ভিখারি হইয়াছি, দান গ্রহণ করিয়া খরচ করি।’

তাহারা এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছিল, এমতো সময়ে কে আসিয়া তাহাদের কুটিরের আগড় ঠেলিয়া বড়ো শোরগোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বার খুলিয়া দিল—মনে করিয়াছিল যে, সেই তিনিই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। পোড়া কপাল! তিনি কেন? পোড়ারমুখো, কাপুড়ে মিন্‌সে!

রাধারাণীর মার কুটির বাজারের অনতিদূরে। তাহাদের কুটিরের নিকটেই পদ্মলোচন সাহার কাপড়ের দোকান। পদ্মলোচন খোদ,—পোড়ারমুখো কাপুড়ে মিন্‌সে—একজোড়া নূতন কুঞ্জদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল, এখন দ্বার খোলা পাইয়া তাহা রাধারাণীকে দিল। বলিল, 'রাধারাণীর এই কাপড়।'

রাধারাণী বলিল, 'ওমা! আমার কীসের কাপড়!' পদ্মলোচন—সে বাস্তবিক পোড়ারমুখো কিনা, তাহা আমরা সবিশেষ জানি না—রাধারাণীর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল; বলিল, 'কেন, এই যে এক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল যে, এই কাপড় এখনই ওই রাধারাণীকে দিয়া এসো।'

রাধারাণী তখন বলিল, 'ওমা সেই গো! সেই। তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাঁ গা পদ্মলোচন?'—

রাধারাণীর পিতার সময় হইতে পদ্মলোচন ইহাদের কাছে সুপরিচিত—অনেকবারই ইহাদিগের নিকট যখন সুদিন ছিল, তখন চারি টাকার কাপড়ে শপথ করিয়া আট টাকা সাড়ে বারো আনা, আর দুই আনা মুনাফা লইতেন।

'হাঁ পদ্মলোচন—বলি সেই বাবুটিকে চেন?'

পদ্মলোচন বলিল, 'তোমরা চেন না?'

রা। না।

প। আমি বলি তোমাদের কুটুম্ব। আমি চিনি না।

যাহা হউক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মায় মুনাফা আট টাকা সাড়ে চোদ্দো আনায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া, প্রসন্নমনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাধারাণী, প্রাপ্ত টাকা ভাঙাইয়া মায়ের পথ্যের উদ্যোগের জন্য বাজারে গেল। বাজার করিয়া, তৈল আনিয়া প্রদীপ জ্বালিল। মার জন্য যৎকিঞ্চিৎ রন্ধন করিল। স্থান পরিষ্কার করিয়া মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্রায়ে ঘর ঝাঁটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল—হাতে করিয়া তুলিল—'এ কী মা!'

মা দেখিয়া বলিলেন, 'একখানা নোট!'

রাধারাণী বলিল, 'তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন।'

মা বলিলেন, 'হাঁ! তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখো, তোমার নাম লেখা আছে।'

রাধারাণী বড়োঘরের মেয়ে, একটু অক্ষরপরিচয় ছিল। সে পড়িয়া দেখিল, তাই বটে। লেখা আছে।

রাধারাণী বলিল, 'হাঁ মা, এমন লোক কে মা!'

মা বলিলেন, 'তাঁহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এই জন্য নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম রুক্মিণীকুমার রায়।'

পরদিন মাতায় কন্যায়, রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু শ্রীরামপুরে বা নিকটবর্তী কোনো স্থানে রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে, এমত কোনো সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙাইল না—তুলিয়া রাখিল—তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।

(নির্বাচিত অংশ)

এই তার পরিচয়

কবিতা সিংহ

ভেবেছিল আর উঠবে না।
ভেঙে গেছে হাঁটু তার   ভেঙে গেছে বুকের পাঁজর
জলে ভাসছে শব তার   উদোল উপুড়
ভেবেছিলে দুর্নামের ঝাঁক ঝাঁক পুঁটি
খুব্‌লে খেয়ে যাবে তার চোখ
ভেবেছিলে বজ্রপাতে ভেঙে গেছে তার শিরদাঁড়া
দুঃখ দিয়েছ তাকে, যাতনা দিয়েছ আর শোক।

শোক খেয়ে গেছে তার রক্তের কমজোর কণিকা
তার সব বিষ, সব নীল,   সব অহমিকা
কীটদষ্ট পুঁথির মতন তার ছিদ্র করে নিয়েছে জলুশ
চিনতে পারে না তাকে তাহার ভাস্করও

কোথায় সে আনকোরা? কোথায় পালিশ?
দাঁড়িয়ে রয়েছে তবু, খাড়া সে যে
                    কখনও ঝোঁকেনি

এখন সে মূর্তি নয়   নয়তো প্রতিমা
এখন সে পৃথিবীর   পৃথিবী-পাথর
বেদনার কারুকর্মে   শোকের কর্ণিকে
এখন সে নারী এক   দৃষ্টান্তের মতো।

চন্দ্রনাথ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সারকুলার রোডের সমাধিক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রনাথের কথাই ভাবিতে ভাবিতে বাড়ি ফিরিলাম। কত কথা মনে হইতেছে! দীর্ঘ এত দিনের জীবন-ইতিহাসের মধ্যে কয়টি পৃষ্ঠায় চন্দ্রনাথ গভীর রাত্রির মধ্যগগনচারী কালপুরুষ নক্ষত্রের মতো দীপ্তিতে পরিধিতে, প্রদীপ্ত ও প্রধান হইয়া আছে। কালপুরুষ নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্রনাথের তুলনা করিয়া আমার আনন্দ হয়। ওই নক্ষত্রটির খড়্গাধারী ভীমকায় আকৃতির সঙ্গে চন্দ্রনাথের আকৃতির যেন একটা সাদৃশ্য আছে। এমনই দৃপ্ত ভঙ্গিতে সেও আপনার জীবনের কক্ষপথে চলিয়াছে, একদিন পিছনে ফিরিয়া চাহিল না, ক্ষণিক বিশ্রাম করিল না, যাহাকে কুক্ষিগত করিবার অভিপ্রায়ে তাহার এ উন্মত্ত যাত্রা তাহাকে আজও পাইল না, তবু সে চলিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একজনকে মনে পড়িতেছে—হীরুকে।

চন্দ্রনাথ, হীরু, আমি সহপাঠী। আরও একজনকে মনে পড়িতেছে—চন্দ্রনাথের দাদা নিশানাথবাবুকে। কেমন করিয়া যে এই তিনজন একই সময়ে ক্ষুদ্র একটি গ্রামের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু

বিস্ময় প্রকাশ করিব না। আগ্নেয়গিরি গর্ভের মধ্যে কল্পনাতীত বিচিত্র সমাবেশে যত কিছু প্রলয়ংকর দাহ্য বস্তু সমাবিষ্ট হয় কী করিয়া! এও হয়তো সেই বিচিত্র সমাবেশ।

ঘরে কেহ নাই। টেবিলের উপর টেবিল-ল্যাম্পটা অকম্পিত প্রদীপ্ত জ্যোতিতে জ্বলিতেছে। আলোকিত কক্ষের মধ্যে একা বসিয়া চন্দ্রনাথ, হীরু ও নিশানাথকে ভাবিতেছি। সম্মুখেই দেওয়ালে বিলম্বিত বড়ো আয়নাটির মধ্যে আমারই প্রতিবিম্ব আমার দিকে চিন্তাকুল নেত্রে চাহিয়া বসিয়া আছে। অলীক কায়াময় ছায়া, তবু সে আমার এই স্মৃতি-স্মরণে বাধা দিয়া তাহারই দিকে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। আলোটা নিভাইয়া দিলাম। মুহূর্তে ঘরখানা প্রগাঢ় অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল।

অতীতের রূপ এই অন্ধকার। আলোকিত যে দিবসটি অবসান হইয়া তমসা-পারাবারের মধ্যে ডুব দিল, আর সে তো আলোকিত প্রত্যক্ষের মধ্যে ফেরে না। তাই অন্ধকারের মধ্যে তাহাকে খুঁজিতেছি। সে দেখা দিল। অন্ধকারের মধ্যে সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল কিশোর চন্দ্রনাথ। দীর্ঘাকৃতি সবল সুস্থ দেহ নির্ভীক দৃষ্টি কিশোর। অসাধারণ তাহার মুখাকৃতি; প্রথমেই চোখে পড়ে চন্দ্রনাথের অদ্ভুত মোটা নাক; সামান্য মাত্র চাঞ্চল্যেই নাসিকাপ্রান্ত স্ফীত হইয়া ওঠে। বড়ো বড়ো চোখ, চওড়া কপাল, আর সেই কপালে ঠিক মধ্যস্থলে শিরায় রচিত এক ত্রিশূল-চিহ্ন। এই কিশোর বয়সেও চন্দ্রনাথের ললাটে শিরার চিহ্ন দেখা যায়। সামান্য উত্তেজনায় রক্তের চাপ ঈষৎ প্রবল হইলেই নাকের ঠিক উপরেই মধ্য-ললাটের ওই ত্রিশূল-চিহ্ন মোটা হইয়া ফুলিয়া ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে হেডমাস্টারমহাশয়কে মনে পড়িতেছে। শীর্ণ দীর্ঘকায় শান্তপ্রকৃতির মানুষটি—ওই যে বোর্ডিং-এর ফটকের সম্মুখেই চেয়ার-বেঞ্চের আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন। হুঁকাটি হাতে ধরাই আছে। চিন্তাকুল বিমর্ষ নেত্রে আমাকে বলিলেন—নরু, তুমি একবার জেনে এসো তো চন্দ্রনাথ কী বলে!

দুর্দান্ত চন্দ্রনাথের আঘাতে সমস্ত স্কুলটা চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময়; চন্দ্রনাথ প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করিয়া পত্র দিয়াছে। সেকেন্ড প্রাইজ সে গ্রহণ করিতে চায় না। সে আজ পর্যন্ত কখনও সেকেন্ড হয় নাই। তাঁহার কথা অবহেলা করিতে পারিলাম না।

চন্দ্রনাথের কাছেই গেলাম। দারিদ্র্য-জীর্ণ স্বল্পালোকিত চন্দ্রনাথের ঘরখানার মধ্যে চন্দ্রনাথ বসিয়া আপন মনে কী লিখিতেছিল। তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। সে লিখিতেই থাকিল, কোনো অভ্যর্থনা করিল না; সে তাহার স্বভাব নয়। আমি নিজেই বসিয়া প্রশ্ন করিলাম, কী লিখছিস?

লিখিতে-লিখিতেই চন্দ্রনাথ উত্তর দিল, ইউনিভার্সিটি এগ্‌জামিনের রেজাল্ট তৈরি করছি। কে কত নম্বর পাবে তাই দেখছি।

তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। চন্দ্রনাথ আরও খানিকটা লিখিয়া কাগজখানা আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, দেখ।

কাগজটায় চোখ বুলাইতেছিলাম। চন্দ্রনাথ বলিতেছিল, আমার যদি সাড়ে-পাঁচশো কী তার বেশি ওঠে, তবে স্কুলের এই রেজাল্ট হবে—মানে দুটো ফেল, অমিয় আর শ্যামা; তা ছাড়া সব পাশ হবে। আর আমার যদি পাঁচশো-পঁচিশের নীচে হয়, তবে দশটা ফেল; তুই তাহলে থার্ড ডিভিশনে যাবি।

বেশ মনে পড়িতেছে, তাহার কথা শুনিয়া রাগ হইয়াছিল। এই দাম্ভিকটা যেন ফেল হয়—এ কামনাও বোধ হয় করিয়াছিলাম।

চন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, তুই বোধ হয় রাগ করছিস? কিন্তু অনুপাতের আঙ্কিক নিয়মে যার মূল্য যতবার কষে দেখবে, একই হবে। একের মূল্য কমে, সকলের কমবে। দিস ইজ ম্যাথ্‌ম্যাটিক্‌স।

আমি এইবার কথাটা পাড়িব ভাবিতেছিলাম, কিন্তু সে হইল না। চন্দ্রনাথের দাদা একখানা পত্র হাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, চন্দ্রনাথের হাতে পত্রখানা দিয়া বলিলেন, এ কী!

পত্রখানার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া চন্দ্রনাথ অসংকোচে বলিল, আমি সেকেন্ড প্রাইজ রিফিউজ করেছি।

কারণ?

কারণ? চন্দ্রনাথের নাসিকাপ্রান্ত স্ফীত হইয়া উঠিল, ললাটে শিরায় রচিত ত্রিশূল-চিহ্ন ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল— কারণ, সেকেন্ড প্রাইজ নেওয়া আমি বিনিথ মাই ডিগ্‌নিটি বলে মনে করি।

চন্দ্রনাথের দাদা ক্ষোভে যেন কাঁপিতেছিলেন, বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া তিনি বলিলেন, কথাটা বলতে তোমার লজ্জায় বাধল না? ডিগ্‌নিটি! একে তুমি ডিগ্‌নিটি বল? তোমার অক্ষমতার অপরাধ!

বাধা দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, তুমি জান না দাদা।

কী জানি না? জানবার এতে আছে কী?

স্কুলের সেক্রেটারির ভাইপো ফার্স্ট হয়েছে, সে আমারই সাহায্যে হয়েছে। আর ওর যে প্রাইভেট মাস্টার—স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার—তিনি, কী বলব, প্রশ্নপত্র ছাত্রটির কাছে গোপন রাখেননি। তারও ওপর উত্তর বিচারের সময় ইচ্ছাকৃত ভুলও করেছেন তিনি এবং আরও দু-একজন।

চন্দ্রনাথের দাদার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। ভদ্রলোক নির্বিরোধী শান্তপ্রকৃতির মানুষ। তিনি অবাক হইয়া চন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চন্দ্রনাথ বলিল, অঙ্কের পরীক্ষার দিন সে আমায় মিনতি করলে, আমি তাকে তিনটে অঙ্ক আমার খাতা থেকে টুকতে দিলাম। মাস্টার পূর্বে বলে দেওয়া সত্ত্বেও সে সময় তার মনে ছিল না।

চন্দ্রনাথের দাদা গম্ভীর এবং ধীর কণ্ঠস্বরে বলিলেন, তোমার সঙ্গে তর্ক করে ফল নেই। তুমি ওই পত্র প্রত্যাখ্যান করে ক্ষমা চেয়ে হেডমাস্টার মহাশয়কে পত্র লেখো, বুঝলে?

চন্দ্রনাথ বলিল, না।

কঠোরতর-স্বরে চন্দ্রনাথের দাদা বলিলেন, তোমায় করতে হবে।

না।

না? চন্দ্রনাথের দাদা যেন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন এবার।

না।

করবে না?—ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর এবার কাঁপিতেছিল।

না।

কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চন্দ্রনাথের দাদা বলিলেন, তোমার বউদি বলত, আমি বিশ্বাস করিনি, কিন্তু তুমি এতদূর স্বাধীন হয়েছ? ভালো, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সংস্রব রইল না। আজ থেকে আমরা পৃথক।

অবিচলিত কণ্ঠস্বরে চন্দ্রনাথ বলিল, বেশ।

চন্দ্রনাথের দাদা নতশিরে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি নিশ্চয়ই এ উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই, বিশেষ এমন সংযত নিরুচ্ছ্বসিত কণ্ঠের উত্তর। আমি বেশ বুঝিলাম, ভদ্রলোক আত্মসংবরণের জন্য বিপুল প্রয়াস করিতেছেন। দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, চোখের দৃষ্টিতে বেদনা ও ক্রোধের সে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এমন বুকে দাগ কাটা দৃষ্টি আমার জীবনে আমি খুব কমই দেখিয়াছি। এক মুহূর্তেও যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। দাদা মুখ তুলিয়া সম্মুখের জানালার ভিতর দিয়া আখড়ার তমালগাছটার দিকে চাহিলেন। কাকের কোলাহল চলিয়াছে সেখানে, তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড়ো কষ্ট হইল। আজও এই অন্ধকারের মধ্যে আমি চোখ মুদিলাম।

বোর্ডিং-এ আসিয়া মাস্টারমহাশয়কে সংবাদটা দিতে গিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও সেই তেমনই একা চিন্তাকুল নেত্রে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, কী হলো নরু, সে কী বললে?

তাঁহাকে অকপটেই সমস্ত বলিলাম। তিনি হুঁকাটি হাতে ধরিয়াই নীরবে বসিয়া রহিলেন।

মাস্টারমহাশয় তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, আমি একবার যাব নরেশ? কী বলো তুমি? চন্দ্রনাথের কাছে? না না, পৃথক হবে কেন? নাঃ, ছি!

আমি বলিলাম, না স্যার, আপনি যাবেন না। যদি কথা না শোনে?

শুনবে না, আমার কথা শুনবে না? মাস্টারমহাশয়ের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমি উত্তর দিলাম না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মাস্টারমহাশয় বলিলেন, আমারই অন্যায় হলো। চন্দ্রনাথের দাদাকে না জানালেই হতো। না, ছি ছি ছি!

আমি চলিয়া আসিতেছিলাম, তিনি আবার ডাকিলেন, তুমি বলছো নরেশ, আমার যাওয়া ঠিক হবে না, চন্দ্রনাথ আমার কথা শুনবে না?

আমি নীরবেই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলাম।

দিন দুই পর শুনিলাম চন্দ্রনাথ সত্যই দাদার সহিত পৃথক হইয়াছে। চন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিলাম, সে বলিল, পৃথক মানে কী? সম্পত্তি তো কিছুই ছিল না, মাত্র বাড়িখানা আর বিঘে কয় জমি, কিছু বাসন। সে ভাগ হয়ে গেল। আমাকে তো এইবার নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হতো, এ ভালোই হলো।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। বোধ হয় সেদিন সে সময়ে ভাবিয়াছিলাম, চন্দ্রনাথের সহিত সংস্রব রাখিব না। মনে মনে সংকল্পটা দৃঢ় করিতেছিলাম।

চন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, হীরু এসেছিল আজ আমার কাছে। বলে, কাকা বলছেন তোমাকে তিনি একটা স্পেশাল প্রাইজ দেবেন।

হীরুই সেবার ফার্স্ট হইয়াছিল—আমাদের স্কুলের সেক্রেটারির ভাইপো।

আমি প্রশ্ন করিলাম, কী বললি তুই?

চন্দ্রনাথ বলিল, তার কাকাকে ধন্যবাদ দিয়ে পাঠালাম, আর বলে দিলাম, একান্ত দুঃখিত আমি, সে গ্রহণ করতে আমি পারি না। এই প্রস্তাবই আমার পক্ষে অপমানজনক।

চন্দ্রনাথের মুখের দিকেই চাহিয়া ছিলাম। সে আবার বলিল, হেডমাস্টারমশায়ও ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকেও উত্তর দিয়ে দিলাম, গুরুদক্ষিণার যুগ আর নেই। স্কুলের সঙ্গে দেনা-পাওনা আমার মিটে আছে, দু-তিন মাসের মাইনে বাড়তি দিয়ে এসেছি আমি। সুতরাং যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমার।

সেই মুহূর্তে উঠিয়া আসিলাম।

দুই

ইহার পরই আমি চলিয়া গেলাম মামার বাড়ি। পরীক্ষার খবর বাহির হইলে হীরুর পত্র পাইয়া কিন্তু অবাক হইয়া গেলাম, চন্দ্রনাথের অনুমান অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে। হীরু কলিকাতা হইতে দীর্ঘ পত্রে সমস্ত ফলাফল জানাইয়াছে। দেখিলাম, দশটি ছেলে ফেল হইয়াছে, আমি তৃতীয় বিভাগেই কোনোরূপে পাশ হইয়া গিয়াছি, চন্দ্রনাথও পাঁচশো-পঁচিশ পায় নাই। কিন্তু একটি শুধু মেলে নাই—হীরু চন্দ্রনাথকে পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে। হীরু লিখিয়াছে, সে স্কলারশিপ্ পাইবে। মনে মনে দুঃখিত না হইয়া পারিলাম না, সত্য বলিতে কী, চন্দ্রনাথ ও হীরুতে অনেক প্রভেদ! চন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বে আমার অন্তত সন্দেহ ছিল না। অপরাহ্ণে পাঁচটার ট্রেনে মামার বাড়ি হইতে ফিরিয়াই সঙ্গে সঙ্গে হীরুর বাড়িতে প্রীতিভোজনের নিমন্ত্রণ পাইলাম। হীরু স্কলারশিপ্ পাইবে, তাহারই প্রীতিভোজ।

আমি কিন্তু প্রথমেই গেলাম চন্দ্রনাথের বাড়ি। নির্জন বাড়িখানা খাঁ খাঁ করিতেছিল। কেহ কোথাও নাই, শয়নঘরখানারও দুয়ার বন্ধ, কড়ায় একটা অতি সামান্য দামের তালা ঝুলিতেছে।

সন্ধ্যায় হীরুর বাড়ি গেলাম। উৎসবের বিপুল সমারোহ সেখানে। হীরু ধনীর সন্তান, অর্থের অভাব নাই; চিনা লণ্ঠন ও রঙিন কাগজের মালার নিপুণ বিন্যাসে তাহাদের বাড়ির পাশের আমবাগানটার সে শোভা আজও আমার মনে আছে। হীরুর কাকা শৌখিন ধনীসন্তান বলিয়া জেলার মধ্যে খ্যাতি ছিল, তিনি নিজে সেদিন বাগানটাকে সাজাইয়াছিলেন। বিশিষ্ট অতিথিও অনেক ছিলেন, জনদুয়েক ডেপুটি, ডি. এস. পি., স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রার, থানার দারোগা, তাহা ছাড়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভদ্রলোকজন সকলেই প্রায় উপস্থিত ছিলেন।

হীরুকে স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, লাবণ্যময় দেহ, আয়ত কোমল চোখে মোহময় দৃষ্টি। হীরুর কথা মনে করিয়া আকাশের দিকে চাহিলে, মনে পড়ে শুকতারা। অমনই প্রদীপ্ত, কিন্তু সে দীপ্তি কোমল স্নিগ্ধ।

হীরু পরম সমাদর করিয়া আমাকে বসাইল। নানা কথার মধ্যে সে বলিল, কাকা বলছিলেন, এখন থেকে আই সি. এস.-এর জন্যে তৈরি হও। বিলেতে যেতে হবে আমাকে। বিলেতে যাবার আমার বড়ো সাধ, নরু।

আমার কিন্তু বারবার মনে পড়িতেছিল চন্দ্রনাথকে। কিন্তু সেদিন সেখানে তাহার কথা আমি তুলিতে পারি নাই। হীরুই বলিল, আজই দুপুরে সে চলে গেল। আমি তার আগেই তাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম, তবুও সে চলে গেল! একটা দিন থেকে গেলে কী হতো?

হীরু বলিল, মাস্টারমশায়—মাস্টারমশায়।

সচেতন হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, শীর্ণকায় দীর্ঘাকার মানুষটি এন্ডির চাদরখানি গায়ে দিয়া আমাদের দিকেই আসিতেছেন। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

হাসিয়া মাস্টারমহাশয় বলিলেন, আজই এলে নরেশ?

মাস্টারমহাশয়ের ওইটুকু এক বিশেষত্ব, ছাত্র তাঁহার অধিকারের গণ্ডি পার হইলেই সে আর 'তুই' নয়, তখন সে 'তুমি' হইয়া যায় তাঁহার কাছে।

তিনি আবার বলিলেন, তুমি পড়বে নিশ্চয় নরেশ। কিন্তু সাহিত্যচর্চাটা পড়ার সময় একটু কম করো বাবা। তবে ছেড়ো না, ও একটা বড়ো জিনিস। জেনো, Shame in crowd but solitary pride হওয়াই উচিত ও বস্তু।

আমি চুপ করিয়া থাকিলাম। হীরু বলিল, নরুর লেখা যে কাগজে বেরিয়েছে এবার স্যার।

হ্যাঁ? বেশ, বেশ। আমাকে লেখাটা দেখাবে তো নরেশ, পড়ব আমি।

তারপর আমাকে প্রশ্ন করিলেন, চন্দ্রনাথ কোথায় গেল, কাউকে বলে গেল না? তোমাকেও কি কিছু জানিয়ে যায়নি—পত্র-টত্র লিখে?

বলিলাম, না স্যার, কাউকেই সে কিছু জানিয়ে যায়নি।

লাঠির উপর ভর দিয়া মাস্টারমহাশয় কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কী যেন তিনি চিন্তা করিতেছিলেন। আমরাও নীরব।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাস্টারমহাশয় নীরবেই চলিয়া গেলেন, আমরা আবার বসিলাম।

হীরু বলিল, চন্দ্রনাথ একখানা চিঠি দিয়ে গেছে। দেখবি?

চিঠিখানা দেখিলাম, সে লিখিয়াছে—

প্রিয়বরেষু, (প্রিয়বরেষু কাটিয়া লিখিয়াছে) প্রীতিভাজনেষু,

আজই আমার যাত্রার দিন, সুতরাং থাকিবার উপায় নাই, আমাকে মার্জনা করিও। তোমার সফলতায় আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু একটা কথা বারবার মনে হইতেছে, এ উৎসবটা না করিলেই পারিতে। স্কলারশিপটা কী এমন বড়ো জিনিস! ভালোবাসা জানিবে। ইতি— চন্দ্রনাথ

চিঠিখানা হীরুকে ফিরাইয়া দিলাম। হীরু বলিল, চিঠিখানা রেখে দিলাম আমি। থাক, এইটেই আমার কাছে তার স্মৃতিচিহ্ন।

সে আবার প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, কোথায় গেল সে? করবেই বা কী?

সে যেন নিজেও এ কথা চিন্তা করিয়া দেখিতেছিল!

উত্তর দিয়াছিলাম, জানি না।

কিন্তু কল্পনা করিয়াছিলাম, কিশোর চন্দ্রনাথ কাঁধে লাঠির প্রান্তে পোঁটলা বাঁধিয়া সেই রাত্রেই জনহীন পথে একা চলিয়াছে। দুই পাশে ধীর মন্থর গতিতে প্রান্তর যেন পিছনের দিকে চলিয়াছে, মাথার উপরে গভীর নীল আকাশে ছায়াপথ, পার্শ্বে কালপুরুষ নক্ষত্র সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।

(সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত)

লেখক পরিচিতি

[লেখকদের নাম বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে]

অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১ — ১৯৮৬) : আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। *একমুঠো, পারাপার, পালাবদল, পুষ্পিত ইমেজ, ঘরে ফেরার দিন* তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যু পলজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে *সাহিত্য অকাদেমি* পুরস্কার পান।

অজিত দত্ত (১৯০৭ — ১৯৭৯) : জন্ম ঢাকার বিক্রমপুরে। তিন এবং চারের দশকের আধুনিক বাংলা কবিতার একজন বিশিষ্ট কবি। বন্ধু বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তরুণ বয়সেই সম্পাদনা করেন *প্রগতি* পত্রিকা। *কল্লোল* সাহিত্য গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক অজিত দত্ত *কবিতা* পত্রিকার সূচনা থেকেই ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *কুসুমের মাস, পাতালকন্যা, নষ্টচাঁদ, পুনর্নবা, ছড়ার বই, ছায়ার আলপনা* প্রভৃতি।

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪—২০০২) : জন্ম ওড়িশার ঢেঙ্কানলে। প্রথম জীবনে ওড়িয়া ভাষায় সাহিত্য রচনা করলেও পরবর্তী জীবনে বাংলাভাষায় বহু মননসমৃদ্ধ উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *তারুণ্য।* তাঁর লেখা অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *পথে প্রবাসে, সত্যাসত্য, যার যেথা দেশ* প্রভৃতি। তাঁর লেখা *উড়কি ধানের মুড়কি, রাঙা ধানের খই* প্রভৃতি ছড়ার বই ছোটোদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। অন্নদাশংকর রায় *লীলাময় রায়* ছদ্মনামেও বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

কবিতা সিংহ (১৯৩১ — ১৯৯৮) : কবি, ছোটোগল্প রচয়িতা এবং ঔপন্যাসিক। সুলতানা চৌধুরী ছদ্মনামেও লিখেছেন। সহজসুন্দরী, প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ, *চার জন রাগী যুবতী, সোনা রূপার কাঠি, পাপ পুণ্য পেরিয়ে, পৌরুষ* প্রভৃতি উপন্যাসের স্রষ্টা।

কালিদাস : প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত ভাষার স্বনামধন্য কবি। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের অন্যতম প্রধান রূপে গণ্য হয়ে থাকেন। কথিত আছে যে, ইনি দেবী সরস্বতীর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁর প্রসাদে ও উপদেশে সরস্বতীকুণ্ডে অবগাহন ও তার জল পান করে মহামূর্খ-ও অতিশয় নির্বোধ থেকে মহাকবি হয়ে ওঠেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে — অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্রম্, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার প্রভৃতি। ইনি পশ্চিম মালবের অধিবাসী এবং খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমিত হয়ে থাকে।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬) : কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য* নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা *মুক্তি* প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে *বিজলী* পত্রিকায় *বিদ্রোহী* কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কবি তাঁর কবিতায় কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, সমস্ত অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর রচিত বইগুলো হলো — *অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণীমনসা, প্রলয়শিখা।*

জসীমউদ্দীন (১৯০৪—১৯৭৬) : পল্লিকবি হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ এই কবির জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরে। *নক্সীকাঁথার মাঠ, রাখালী, বালুচর, ধানক্ষেত, সোজনবাদিয়ার ঘাট* তাঁর অমর সৃষ্টি। *বেদের মেয়ে*

শীর্ষক গীতিনাট্য, *চলে মুসাফির* নামক ভ্রমণ কাহিনি ও *ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়* গ্রন্থরচনায় তাঁর সাহিত্য প্রতিভার অনন্যতা ধরা পড়েছে। পাঠ্যাংশটি তাঁর *সোজনবাদিয়ার ঘাট* কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯—১৯৫৪): রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান এই কবির জন্ম অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরাপালক* ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে - *ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা* প্রভৃতি। তাঁর রচিত আখ্যানের মধ্যে রয়েছে — *মাল্যবান, সুতীর্থ, জলপাইহাটি* প্রভৃতি পাঠ্য কবিতাটি তাঁর *রূপসী বাংলা* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮ — ১৯৭১) : জন্ম বীরভূমের লাভপুরে। পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করেন। কর্মসূত্রে কিছুদিন কলকাতা ও কানপুরে ছিলেন। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে *ত্রিপত্র* কবিতা সংকলন প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তাঁর সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত। আধুনিককালের অগ্রগণ্য এই ঔপন্যাসিকের রচিত বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে— *কালিন্দী, আরোগ্যনিকেতন, কবি, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, ধাত্রীদেবতা, মন্বন্তর, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* ইত্যাদি। *জলসাঘর, বেদেনী, রসকলি, ডাকহরকরা, নারী ও নাগিনী, তারিণী মাঝি* প্রভৃতি তাঁর লেখা বিখ্যাত ছোটোগল্প। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ স্মৃতি পুরস্কার ও জগত্তারিণী স্মৃতিপদক, রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও জ্ঞানপীঠ সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৭—১৯৭০) : জন্ম দিনাজপুরে। দিনাজপুর, ফরিদপুর, বরিশাল এবং কলকাতায় শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন। বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা ছোটোগল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁর রচিত বিখ্যাত গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে—*বীতংস, দুঃশাসন, ভোগবতী* প্রভৃতি। *উপনিবেশ, বৈজ্ঞানিক, শিলালিপি, লালমাটি, সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, পদসঞ্চার* তাঁর রচিত জনপ্রিয় উপন্যাস। শিশু ও কিশোরদের জন্য তাঁর অন্যতম স্মরণীয় সৃষ্টি *টেনিদা* চরিত্র।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (জন্ম ১৯২৪) : জন্মস্থান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলা। *সত্যযুগ* পত্রিকার সাংবাদিকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন, পরবর্তীকালে *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র সঙ্গে যুক্ত হন। বহুদিন তিনি *আনন্দমেলা* সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলা কবিতার জগতে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অত্যন্ত জনপ্রিয় নাম। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে — *নীল নির্জন, অন্ধকার বারান্দা, কলকাতার যীশু* প্রভৃতি। *উলঙ্গ রাজা* কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি *সাহিত্য আকাদেমি* পুরস্কার লাভ করেছেন।

প্রমথ চৌধুরি (১৮৬৮ — ১৯৪৬) : জন্ম যশোরে। পিতা দুর্গাদাস চৌধুরি। কলকাতার হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে লেখাপড়া করেছেন। পরবর্তীকালে কলকাতা হাইকোর্টে কিছুদিন ব্যারিস্টারি করেন। আইন কলেজে অধ্যাপনাও করেছেন। ইংরাজি ও ফরাসি সাহিত্যে সুপণ্ডিত এই লেখক বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষাকে মর্যাদা দিয়ে ১৯১৪ খ্রি: *সবুজপত্র* পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর ছদ্মনাম *বীরবল*। মূলত প্রাবন্ধিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও বেশ কিছু গল্প ও কবিতাও রচনা করেছেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করেন। প্রমথ চৌধুরি রচিত নানান গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— *সনেট পঞ্চাশৎ, পদচারণ, চারইয়ারি কথা, আহুতি, নীললোহিত* প্রভৃতি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪—১৯৮৮) : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি-লেখক। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রথমা*। অন্যান্য বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *সম্রাট, ফেরারী ফৌজ, সাগর থেকে ফেরা*। উপন্যাস — *পাঁক, প্রতিশোধ, আগামীকাল* ইত্যাদি। *ঘনাদা* চরিত্রের স্রষ্টা। বহু ছোটোগল্প লিখেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ — ১৮৯৪) : জন্ম চব্বিশ পরগনার কাঁঠালপাড়ায়। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম পুরোধা, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের স্রষ্টা। প্রথম জীবনে সংবাদ প্রভাকরের পাতায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হলেও তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা ইংরাজিতে (Rajmohan's wife)। ১৮৬৫ খ্রি: তাঁর রচিত *দুর্গেশনন্দিনী* বাংলা উপন্যাস ভাষা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় *কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী* ইত্যাদি উপন্যাস। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিম ১৮৭২ খ্রি: *বঙ্গদর্শন* নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন যা বাংলা পত্রপত্রিকার সংস্কৃতিকে চমৎকৃত করে। বঙ্গদর্শনের নানা সংখ্যায় ছড়িয়ে আছে বঙ্কিমের বহু প্রবন্ধ এবং যুগান্তকারী সব উপন্যাস—*বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল* ইত্যাদি। ১৮৮২ খ্রি: প্রকাশিত তাঁর *আনন্দমঠ* উপন্যাসটি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শুধু উপন্যাস রচনাতেই নয় বহু বিষয়ক প্রবন্ধ রচনাতেও তাঁর অবদান অসামান্য। *লোকরহস্য, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, কমলাকান্তের দপ্তর* ইত্যাদি প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে লুকিয়ে আছে বঙ্কিমের মননের দীপ্তি, তীব্র ব্যঙ্গবোধ, ইতিহাস ও সমাজচেতনা আর আবেগ ও কৌতুক প্রবণতা। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক সমালোচনার ধারাতেও তিনি পথদ্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম।

বিষ্ণু দে (১৯০৯—১৯৮২) : আধুনিক কালের অগ্রগণ্য এই কবি কলকাতার বিখ্যাত শ্যামাচরণ দে বিশ্বাসের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ *উর্বশী ও আর্টেমিস* ১৯৩২ খিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা অন্যান্য বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে — *চোরাবালি, পূর্বলেখ, সন্দ্বীপের চর, অন্বিষ্ট, নাম রেখেছি কোমলগান্ধার, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ, সেই অন্ধকার চাই, উত্তরে থাকো মৌন* প্রভৃতি। *রুচি ও প্রগতি, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, সাহিত্যের দেশ বিদেশ, মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা* তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। তিনি অজস্র বিদেশি কবিতার অনুবাদ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে *এলিঅটের কবিতা, হে বিদেশী ফুল, আফ্রিকায় এশিয়ায় মুরলী মৃদঙ্গ তূর্যে* প্রভৃতি গ্রন্থ।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪ — ১৯৮৭) : আদি নিবাস হুগলির চাতরা, পিতা বিপিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পড়াশোনা করেছেন দ্বারভাঙা ও পাটনায়। *ইন্ডিয়ান নেশন* পত্রিকায় কার্যাধ্যক্ষ হিসেবে, দ্বারভাঙা মহারাজের সচিব হিসেবে কাজ করেছেন। করেছেন শিক্ষকতা। তাঁর লেখা জনপ্রিয় গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে— *নীলাঙ্গুরীয়, বরযাত্রী, রানী সিরিজের গল্পমালা, স্বর্গাদপী গরীয়সী, একই পথের দুই প্রান্তে* ইত্যাদি। ছোটোদের জন্য লিখেছেন *পোনুর চিঠি, কৈলাসের পাটরানী, দুষ্টু লক্ষ্মীদের গল্প* প্রভৃতি। সাহিত্য রচনার জন্য তিনি শরৎ স্মৃতি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করেন।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০—১৯৮৫) : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। তাঁর রচিত অজস্র কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি, চারপাশের মানুষজন, নানান জীবন সংগ্রাম ও পরিস্থিতি রূপায়িত হয়েছে। *গ্রহচ্যুত, রাণুর জন্য, লখিন্দর, ভিসা অফিসের সামনে, মহাদেবের দুয়ার, মানুষের মুখ, ভিয়েতনাম : ভারতবর্ষ, আমার যজ্ঞের ঘোড়া : জানুয়ারি* ইত্যাদি তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ। তিনি বহু কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ করেছেন।

বেগম রোকেয়া (১৮৮০ — ১৯৩২) : জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের রংপুরের পায়রাবন্দে। পিতা জহিরুদ্দিন মহম্মদ আবু আলি সাবের। পারিবারিক উদ্যোগে তাঁর বাংলা শিক্ষার সূত্রপাত। স্বামী বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যুর পর তিনি ভাগলপুর থেকে ১৯১০ খ্রি: কলকাতায় চলে আসেন। এখানে তিনি স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের সংকল্প নিয়ে ১৯১১ খ্রি: সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। আজীবন কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এই মহীয়সী নারী। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *মতিচুর, পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী* প্রভৃতি।

মহাশ্বেতা দেবী (জন্ম ১৯২৬-২০১৬) : বাবা বিখ্যাত লেখক মণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব)। মহাশ্বেতা দেবী অধ্যাপনা ছাড়া সাংবাদিক হিসাবেও কাজ করেছেন। তিনি বহুদিন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অরণ্যভূমির মানুষের জীবনের সঙ্গে থেকেছেন। জনপ্রিয় উপন্যাস *ঝাঁসির রানী*, *নটী*, *অরণ্যের অধিকার*, *হাজার চুরাশির মা*। ছোটোদের জন্য বিখ্যাত গ্রন্থ *গল্পের গরু ন্যাদোশ*, *এককড়ির সাধ*, *নেই নগরের সেই রাজা বাঘাশিকারী* ইত্যাদি। সমাজসেবামূলক কাজের স্বীকৃতিতে পেয়েছেন 'ম্যাগসেসে' পুরস্কার। সাহিত্যরচনার জন্য আকাদেমি পুরস্কার সহ বহু পুরস্কার পেয়েছেন ।

মুকুন্দ চক্রবর্তী (আনুমানিক ১৫৪৭ — অজ্ঞাত) : জন্ম বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রাম। পিতা হৃদয় মিশ্র। ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে উৎখাত হয়ে তিনি আনুমানিক ১৫৫৭ খ্রি: মেদিনীপুরের আড়রা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের দ্বারস্থ হন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করে কবিকঙ্কণ উপাধি লাভ করেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাঁর রচনাতেই প্রথম উপন্যাসের লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১ — ১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। *কথা ও কাহিনী*, *সহজপাঠ*, *রাজর্ষি*, *ছেলেবেলা*, *শিশু*, *শিশু ভোলানাথ*, *হাস্যকৌতুক*, *ডাকঘর*, *গল্পগুচ্ছ*- সহ তাঁর বহু রচনাই শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। এশিয়ায় তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে 'Song Offerings'- এর জন্যে। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা।

লিও তলস্তয় : কাউন্ট লেও নিকোলায়েভিচ্ তলস্তয় : জন্ম ১৮২৮ সালের ২৬ আগস্ট, রাশিয়ার ইয়াসিনা পলিয়ানায়। নিতান্ত শৈশবে মা-বাবাকে হারিয়ে এক নিকটাত্মীয়ের কাছে তিনি লালিত হন। অন্যান্য বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি শেখেন ফরাসি ও জার্মান ভাষা। ১৮৬২ সাল থেকে তাঁর সাহিত্য জীবনের যথার্থ সূত্রপাত। তলস্তয়ের বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে *দ্য কসাক্স্*, *ওয়ার অ্যান্ড পীস*, *আনা কারেনিনা*, *কন্‌ফেশনস্*, *রেজারেক্সন* প্রভৃতি। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রয়াত হন।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪ — ১৮৮৯) : জন্ম চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়া। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র সরকারি চাকরি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ও বিহারের পালামৌতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেন। *রামেশ্বরের অদৃষ্ট*, *কণ্ঠমালা*, *মাধবীলতা*, *দামিনী* প্রভৃতি তাঁর লেখা উপন্যাস, *পালামৌ* নামক ভ্রমণবৃত্তান্তটি বাংলা সাহিত্যের একটি অক্ষয় সম্পদ। তিনি *ভ্রমর* নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং কিছুদিন *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২) : জন্মস্থান বর্ধমান জেলার চুপি গ্রাম। পিতা রজনীনাথ দত্ত এবং মাতামহ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত। রবীন্দ্র সমকালীন কবিদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় কবি। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো — *সবিতা, সন্ধিক্ষণ, বেণু ও বীণা, ফুলের ফসল, কুহু ও কেকা, বেলাশেষের গান, বিদায় আরতি* প্রভৃতি এবং অনুবাদ কবিতা — *তীর্থসলিল, তীর্থরেণু, মণিমঞ্জুষা* প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যের জগতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ *ছন্দের জাদুকর* নামে পরিচিত। *নবকুমার কবিরত্ন* ছদ্মনামে তিনি বেশ কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪ — ২০১২) : জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুরে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। *আত্মপ্রকাশ* তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস, আর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *একা এবং কয়েকজন*। কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি অসামান্য। ছোটোদের মহলেও সমান জনপ্রিয় তিনি। প্রথম কিশোর-উপন্যাস 'ভয়ংকর সুন্দর'। *নীললোহিত* ছদ্মনাম ছাড়াও *সনাতন পাঠক* ও *নীল উপাধ্যায়* নামে অনেক লেখা লিখেছেন। 'আনন্দ পুরস্কার', 'বঙ্কিম পুরস্কার', 'সাহিত্য আকাদেমি' ইত্যাদি নানা পুরস্কারে তিনি সম্মানিত। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *প্রথম আলো, সেই সময়, পূর্ব পশ্চিম, মনের মানুষ, অর্জুন, অরণ্যের দিনরাত্রি*। গ্রন্থ সংখ্যা দুশোর বেশি। তাঁর লেখাগুলি চলচ্চিত্রে, বেতারে ও টিভির পর্দায় রূপায়িত ও পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত।

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪ — ১৯৭৪) : জন্ম শ্রীহট্টের করিমগঞ্জে। বাবার নাম সৈয়দ সিকান্দর আলি। মহাত্মা গান্ধির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্কুল ছাড়েন। শান্তিনিকেতনে পড়া শেষ করে তিনি কাবুলের শিক্ষাবিভাগে অধ্যাপক হন। তিনি আরবি, ফারসি, জার্মান সহ ১৫টি ভাষা জানতেন। প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, উপন্যাস ও রম্য-রচনায় তাঁর দক্ষতা অসামান্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ '*দেশে বিদেশে*', '*পঞ্চতন্ত্র*', *চাচাকাহিনি, ময়ূরকণ্ঠী, শবনম, ধূপছায়া, টুনিমেম, হিটলার* প্রভৃতি। তিনি 'নরসিংহদাস পুরস্কারে' সম্মানিত।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ — ১৯০২) : বিবেকানন্দের বাল্যনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। জন্ম কলকাতার শিমুলিয়ায়। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত। লেখাপড়া করেছেন মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইন্সটিটিউশনে। কিছুকাল মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষকতাও করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মানব সেবার দীক্ষা নিয়ে ১৮৮৬ খ্রি: বরানগরে মঠ স্থাপন করে বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন। পরিব্রাজক হিসেবে সারা ভারত ভ্রমণ করেন। ১৮৯৩ খ্রি: শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য আমেরিকা যান। ১৮৯৭ খ্রি: রামকৃষ্ণ মিশন ও ১৮৯৯ খ্রি: বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলায় *উদ্বোধন* ও ইংরেজিতে *প্রবুদ্ধ ভারত* নামে দুটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে— *পরিব্রাজক, ভাববার কথা, বর্তমান ভারত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য* প্রভৃতি। সাহিত্যে বাংলা কথ্য ভাষার অন্যতম প্রচারক হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান অনস্বীকার্য। পাঠ্য চিঠিটির উৎস : *পত্রাবলী— স্বামী বিবেকানন্দ*। প্রকাশক— উদ্বোধন কার্যালয়।

হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৭০ — ১৯২৫) : জন্ম কলকাতায়। পিতা জানকীনাথ ঘোষাল, মা স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বামী ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কর্মস্থল রাজসাহী, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেন। ছোটোদের মাসিকপত্র 'সখা'য় তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর ছোটোবোন সরলা দেবীর সঙ্গে কিছুদিন *ভারতী* পত্রিকা সম্পাদন করেন।

শিখন পরামর্শ

নবম শ্রেণির সাহিত্য সঞ্চয়ন একটি নির্দিষ্ট ভাবমূলকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। *পাতাবাহার* ও *সাহিত্যমেলা*, অর্থাৎ তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত ভাবমূল (Theme) সমূহ থেকে নির্বাচিত কয়েকটিকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই প্রত্যেকটি পাঠ বিভিন্ন ভাবমূলের নানা দিককে, প্রথিতযশা কবি ও লেখকদের লেখার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরে। ভাবমূলের বিন্যাস, শিক্ষাবর্ষের একটি নমুনা পাঠ পরিকল্পনা ও নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী প্রশ্নের কাঠামো এবং নম্বরের বিভাজন নিম্নে দেওয়া হলো :

সাহিত্য সঞ্চয়নের ভাবমূলের বিন্যাস :

পাঠের নাম	ভাবমূল
প্রথম পাঠ	প্রচলিত গল্পকথা ও আখ্যানের জগৎ
দ্বিতীয় পাঠ	আমার জগৎ
তৃতীয় পাঠ	দেশ-বিদেশের জগৎ
চতুর্থ পাঠ	রূপময় প্রকৃতি ও কল্পনা
পঞ্চম পাঠ	স্বদেশ ও স্বাধীনতা
ষষ্ঠ পাঠ	বন্ধুত্ব ও সমানুভূতি

শিক্ষাবর্ষে পাঠপরিকল্পনার পাঠক্রম ও সম্ভাব্য সময়সূচি :

মাসের নাম		পাঠের নাম	
জানুয়ারি	প্রথম পর্যায়	কলিঙ্গদেশে ঝড়-বৃষ্টি এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	সহায়ক পাঠ বইয়ের ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়রি’, ‘কর্ভাস’ এবং ‘স্বর্ণপর্ণী’ গল্প তিনটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ক্রম অনুসারে একটি করে গল্প পড়াতে হবে।
ফেব্রুয়ারি		ধীবর-বৃত্তান্ত, ইলিয়াস এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	
মার্চ		দাম, নোঙর এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	
এপ্রিল	দ্বিতীয় পর্যায়	নব নব সৃষ্টি, আকাশে সাতটি তারা এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	
মে		চিঠি এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	
জুন ও জুলাই		আবহমান, রাধারাণী এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	
আগস্ট	তৃতীয় পর্যায়	ভাঙার গান, হিমালয় দর্শন এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	
সেপ্টেম্বর		আমরা, নিরুদ্দেশ এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	
অক্টোবর ও নভেম্বর		চন্দ্রনাথ, খেয়া এবং ব্যাকরণ ও নির্মিতির চর্চা	

প্রশ্নের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন

	বহু বিকল্পীয় প্রশ্ন (MCQ)	অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (Very Short Answer Type)	ব্যাখ্যাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (Short and Explanatory)	রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type)	পূর্ণমান (Total)
গল্প	০২	০৩	০৩	০৭	১৫
কবিতা	০২	০৩	০৩	০৭	১৫
প্রবন্ধ	০২	০৩	-	০৫	১০
নাটক	০৩	০২	-	০৫	১০
সহায়ক গ্রন্থ	০৩	০২	-	০৫	১০
ব্যাকরণ	০৮	০৭	-	-	১৫
নির্মিতি	-	-	-	*১০+০৫	১৫

১০ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কম-বেশি ৩০০ শব্দ
০৭ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কম-বেশি ২০০ শব্দ
০৫ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কম-বেশি ১৫০ শব্দ
০৩ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কম-বেশি ৬০ শব্দ
০১ নম্বরের প্রশ্নের জন্য : কম-বেশি ১৫ শব্দ

* নির্মিতি অংশে প্রবন্ধের উত্তর প্রদান আবশ্যিক।

প্রশ্নের নতুন কাঠামো অনুযায়ী প্রশ্নের নমুনা

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো: প্রতিটি প্রশ্নের মান ১

১.১. 'ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর' — এখানে 'চিকুর' বলতে বোঝানো হয়েছে —

(ক) আকাশকে (খ) বিদ্যুৎকে

(গ) বাতাসকে (ঘ) কোনটিই নয়

১.২. 'নোঙর কখন জানি পড়ে গেছে তটের কিনারে' — উদ্ধৃতাংশটির মাধ্যমে যে ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে, তা হলো —

(ক) পাড়ি দেওয়ার বাসনা থাকলেও বন্ধন ছিন্ন করা যায় না।

(খ) নৌকা নোঙরেই আটকে থাকে।

(গ) ভারী পণ্যের কারণেই নোঙরে নৌকা বাঁধা থাকে।

(ঘ) স্রোতে নোঙর ভেসে গেলে তবে নৌকা পাড়ি দেয়।

২. কম-বেশি ১৫ টি শব্দের মধ্যে উত্তর লেখো : প্রতিটি প্রশ্নের মান ১

২.১. 'ধূলে আচ্ছাদিত হইল যে ছিল হরিত' — বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

২.২. রাজশ্যালক রাজবাড়ি থেকে ফিরে এসে রক্ষীদের কী নির্দেশ দিয়েছিলেন?

৩. প্রসঙ্গ নির্দেশ সহ কম-বেশি ৬০টি শব্দের মধ্যে উত্তর লেখো : প্রতিটি প্রশ্নের মান ৩

৩.১. 'প্রজা ভাবয়ে বিষাদ।' — প্রজাদের মন বিষাদগ্রস্ত কেন?

৩.২. 'সেই আংটিটা রাজার (খুব) প্রিয় ছিল।' — নাট্যাংশের কোন ঘটনা প্রমাণ করে 'আংটিটা রাজার (খুব) প্রিয় ছিল'?

৪. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো (কম-বেশি ১৫০ শব্দ) : প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫

৪.১. বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা আত্মনির্ভরশীল নয়। — 'নব নব সৃষ্টি' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কীভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন? ৫

৪.২. 'এখন থেকে তুমি আমার একজন বিশিষ্ট প্রিয় বন্ধু হলে।' — কারা পরস্পরের বন্ধু হয়েছে? এমন বন্ধুত্বের কারণ কী? ১ + ৪

৫. নীচের প্রশ্নগুলির কম-বেশি ২০০ শব্দের মধ্যে উত্তর লেখো : প্রতিটি প্রশ্নের মান ৭

৫.১. 'অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ' — 'অম্বিকামঙ্গল' এবং তাঁর কবি 'শ্রীকবিকঙ্কণ'-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 'কলিঙ্গদেশে ঝড়-বৃষ্টি' অংশে বর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিচয় দাও। ২ + ৫

৫.২. 'এ অপরাধ আমি বইব কী করে, এ লজ্জা আমি কোথায় রাখব।' — বক্তা কোন কৃতকর্মকে অপরাধ রূপে চিহ্নিত করেছেন? গল্পে এই অপরাধবোধ ও আত্মগ্লানি দূর হয়ে কীভাবে বক্তার আত্মশুদ্ধি ঘটল তা বুঝিয়ে দাও। ৩ + ৪

সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও

৮ জুলাই ২০১৬ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গোটা পশ্চিমবঙ্গ শপথ নিয়েছে পথ সংস্কৃতি মেনে চলার। এ শপথ ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার। এ শপথ সর্তক হয়ে পথ চলার। পথের নিয়ম মেনে চলার লক্ষ্যে প্রশাসন, পুলিশ, পরিবহনকর্মী, পথচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা একসূত্রে গ্রন্থিত হোক। আমরা সিগন্যাল মেনে গাড়ি চালাব। আমরা উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে দুর্ঘটনা ডেকে আনব না। আমরা প্রতিদিন সুস্থ দেহে, নিরাপদে অপেক্ষারত প্রিয়জনদের কাছে ঘরে ফিরে আসব। এই শপথ একদিন-দু-দিন বা একটি সপ্তাহের নয় এ আমাদের আজীবনের অঙ্গীকার হোক। আসুন, আমরা সকলে মিলে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারিত Safe Drive Save Life-এর অঙ্গীকার দৃঢ় করবার শপথ নিই। শপথটি নীচে দেওয়া হলো—

আমাদের প্রতিজ্ঞা

পথ সংস্কৃতি জানব
ট্রাফিক নিয়ম মানব
আমি সতর্ক হয়ে চলব
সুস্থভাবে এগিয়ে যাব
পথকে জয় করব
শান্ত জীবন গড়ব
পথ শুধু আমার নয়
এ পথ মোদের সবার
তা সর্বদা মনে **রাখব**।